বিশেষ সংখ্যা

মার্চ ২০২২ । ফাল্গুন-চৈত্র ১৪২৮

নবারুণ

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

জাতীয় শিশু দিবস

বঙ্গবন্ধুর শিশু আইন

স্বাধীনতা তুমি

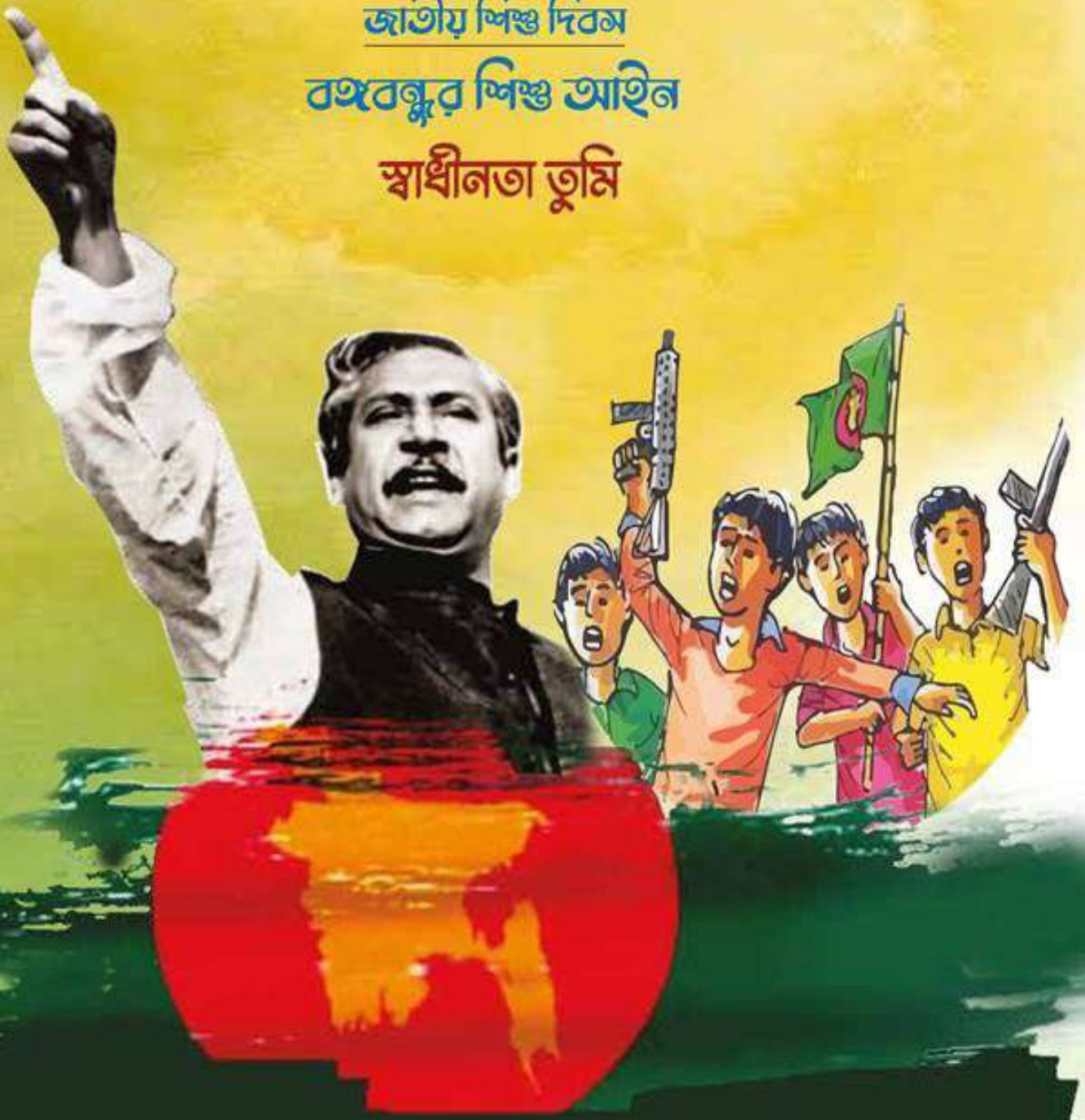

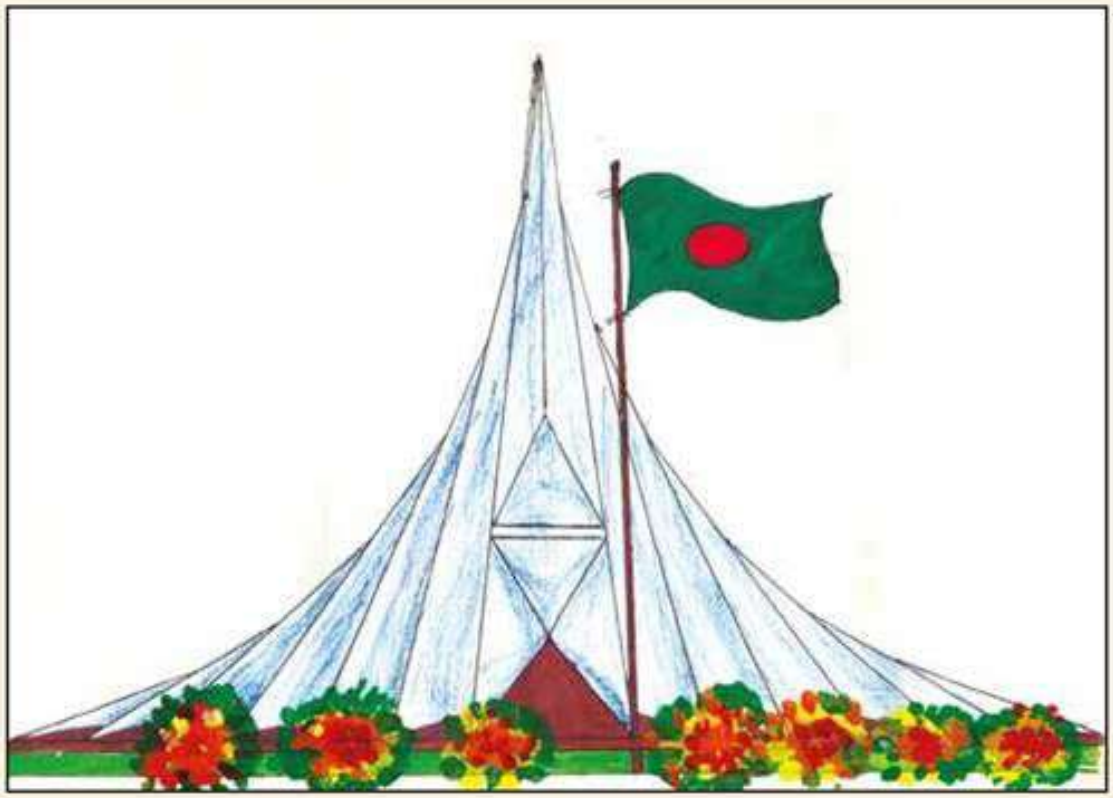

মো. হুসাইন আহমেদ, চতুর্থ শ্রেণি, আলকারিব স্কুল, সাভার, ঢাকা

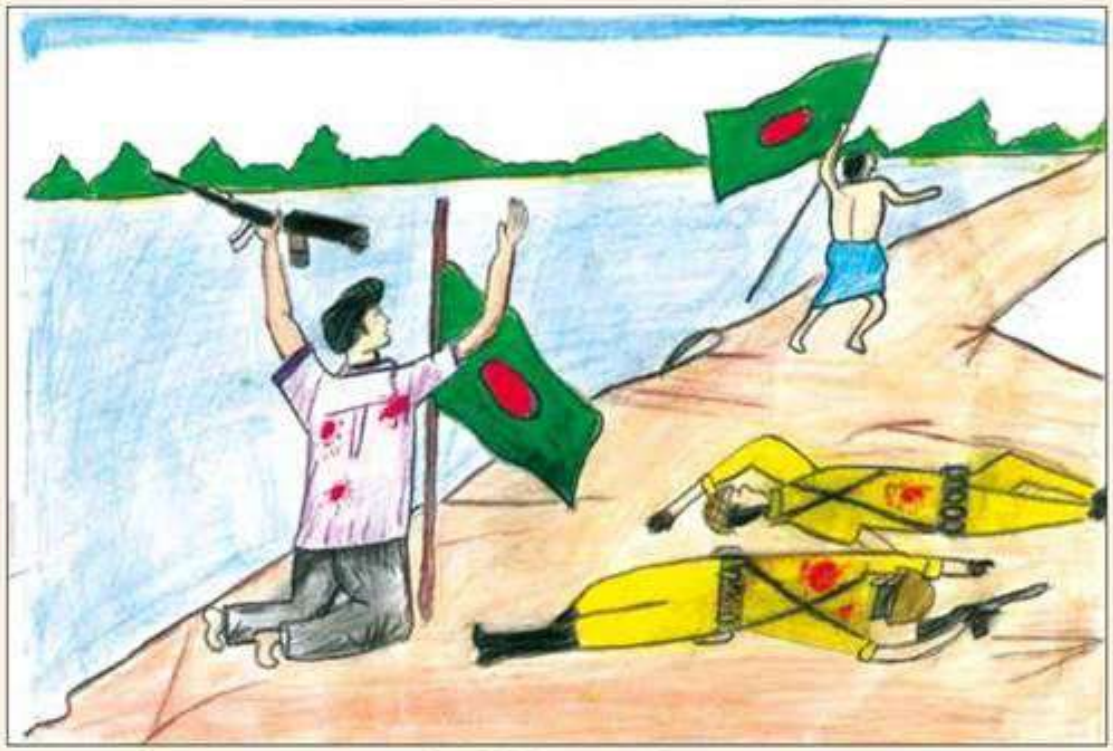

মুহসিনা রহমান, সপ্তম শ্রেণি, বিটিসিএল আইডিয়াল স্কুল, মগবাজার, ঢাকা

সম্পাদকীয়

বন্ধুরা, এসে গেছে অগ্নিঝরা মার্চ মাস। মার্চ মাস আমাদের জাতীয় জীবনে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। তোমরা নিশ্চয়ই জানো, ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ভাষণ দেন। সে ভাষণে তিনি স্বাধীনতার ডাক দেন এবং যুদ্ধে গোটা জাতিকে প্রস্তুত করেন।

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণ এখন বিশ্বপ্রামাণ্য ঐতিহ্য। ২৫শে মার্চ ১৯৭১, রাতের আঁধারে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অপারেশন সার্চলাইটের নামে এদেশের ঘুমন্ত বাঙালির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। যা ইতিহাসের জঘন্যতম গণহত্যা। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এরপর চলে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ।

১৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন ও জাতীয় শিশু দিবস। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য হচ্ছে, 'বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনের অঙ্গীকার, সকল শিশুর সমান অধিকার।' এই শিশু দিবসে সকল শিশুর প্রতি রইল আন্তরিক শুভেচ্ছা। এদিন আমাদের আনন্দের এবং নিজেদেরকে সাহসী করার দিন। আমাদের দেশ ও মানুষকে ভালোবাসা শেখার দিন। ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধু গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটোবেলা থেকেই তিনি দেশকে প্রচণ্ড ভালোবাসতেন। তাঁর দেশপ্রেমের কোনো তুলনা হয় না। তাই তিনি বিশ্ববরেণ্য মহান নেতার মর্যাদা পেয়েছেন।

বন্ধুরা, এ মার্চ মাসেই স্বাধীনতার স্থপতি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকীর সমাপনী। তাই এই মাসটিতে একটি বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করা হলো। আশা করি তোমাদের সবার খুব ভালো লাগবে।

বন্ধুরা, আমাদের এই বিশেষ আয়োজনটি তোমাদের কেমন লাগলো জানাবে। তোমরা সবাই ভালো থেকো। এই কামনায়।

প্রধান সম্পাদক
স. ম. গোলাম কিবরিয়া

সিনিয়র সম্পাদক
হাছিনা আক্তার

সম্পাদক
নুসরাত জাহান

সিনিয়র সহ-সম্পাদক
শাহানা আফরোজ

সহ-সম্পাদক
মো. জামাল উদ্দিন
তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

সহযোগী শিল্পনির্দেশক
সুবর্ণা শীল

অলংকরণ
নাহরীন সুলতানা

সম্পাদকীয় সহযোগী
মেজবাউল হক
মো. মাছুদ আলম
সাদিয়া ইফফাত আঁখি

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা
ফোন : ৮৩০০৬৮৮
E-mail : editornobarun@dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ
সহকারী পরিচালক
ফোন : ৮৩০০৬৯৯

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd

মূল্য : ২০.০০ টাকা

মুদ্রণ : প্রিয়াংকা প্রিন্টিং অ্যান্ড পাবলিকেশন্স, ৭৬/ই নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০

নিবন্ধ

জাতীয় শিশু দিবস ও বঙ্গবন্ধুর শিশু আইন/রফিকুর রশীদ ০৩
বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ ও স্বাধীনতার ঘোষণা /আপন চৌধুরী ০৮
টুঙ্গিপাড়ার খোকা/দেওয়ান বাদল ২৩
সততা, মানবতা ও উদারতায় শেখ মুজিব/রহিম আব্দুর রহিম ৩১
৮ই মার্চ এবং আমাদের অর্জন/হাছিনা আক্তার ৫৯

গল্প

স্বাধীনতা তুমি/ড. শিল্পী ভদ্র ১৪
একাত্তরের শিশু/তৌহিদ উল ইসলাম ৩৪
দ্যা গ্রেট ভোম্বল/মিলন বনিক ৩৭
বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি/অমিত কুমার কুণ্ড ৪১
কমান্ডার আব্দুল হামিদ উচ্চ বিদ্যালয়/শাকিব হুসাইন ৪৪
লাবুর স্বাধীনতার ভাবনা/প্রনব মজুমদার ৪৭
টুলটু গুলটু/কাজী কেয়া ৫২
দেশের ছবি/ইলিয়াস বাবর ৫৬

সাফল্য প্রতিবেদন

জাতীয় সংগীতের অর্কেস্ট্রা ভার্সন/শাহানা আফরোজ ১৯
নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে বাংলাদেশের প্রথম জয়/মেজবাউল হক ৬৪
বিশ্বসেরা বিদ্যাপীঠে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা/ রফিকুর আলম ৬৫
এইচএসসি'র ফলে সবদিকে দিয়ে এগিয়ে মেয়েরা/জান্নাতে রোজী ৬৭
বিশ্ব ডাউন সিনড্রোম দিবস/সানজানা তালুকদার ৬৮
১৪ বছরের নিচে শিশুকে কাজে নেওয়া যাবে না/তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা ৭০
ঐতিহাসিক সিরিজ জয় বাংলাদেশের/মো. আবু নাসের ৭১
শিশু যখন খেতে চায় না/মো. জামাল উদ্দিন ৭২
দশদিগন্ত/সাদিয়া ইফফাত আঁখি ৭৩
লন্ডনে বাংলায় রেলস্টেশনে নাম/শাহাদত হোসেন ৭৪
বুদ্ধিতে ধার দাও/নাদিম মজিদ ৭৫

বড়োদের কবিতা

০৭ মোনায়েম সরকার
১১ মোহাম্মদ আহছান উল্লাহ/শিবুকান্তি দাশ
সোহরাব পাশা
১২ আকলিমা চৌধুরী/মির্জা আয়েশা সিদ্দিকা ত্বাহা
মুহাম্মদ ইসমাঈল
১৩ সালাম ফারুক/রাজন বড়ুয়া/আল জাবিরী
৪৩ নিজামউদ্দীন মুন্সী
৪৯ সৈয়দ জাহিদ হাসান/সোহেল আমিন বাবু
৫০ সৈয়দা সেলিমা আক্তার/এস আই সানী
৫১ আখতারুল ইসলাম/অনার্য আমিন/আজহার মাহমুদ
৫৮ ড. নলিনী রঞ্জন বসাক

ছোটোদের লেখা ও ছড়া

৬২ স্বাধীনতা কথা/জান্নতুল নাঈম
৬৩ তাছমিনা রহমান পূর্ণ/মিহির হুসাইন
সাদিয়া আফরিন/রোমানা নাসের

মুক্তিযুদ্ধের কিশোর উপন্যাস

১৯ রতনপুরের বিচ্ছুবাহিনী/মুস্তাফা মাসুদ

ছোটোদের আঁকা

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ : মো. হুসাইন আহমেদ/মুহসিনা রহমান
১৭ মো. আ. রাজ্জাক সরকার
২৯ মারিশা মাহপারা
৩৩ মোহাম্মদ ইউসুফ তূর্য/সাবিহা তাসবিহ
৬২ ইরিনা হক
৭৯ খাদিজাতুল কোবরা/সানজিনা সিদ্দীকি ওকি
৮০ মৌমিতা আক্তার বন্যা/আফরা তাহমিদ জারা

নবারুণ পত্রিকার ফেসবুক পাতায় (Nobarun Potrika) আপলোডেড পত্রিকা পড়তে পারবে। এছাড়া চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dfp.gov.bd-এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে।

মোবাইলে নবারুণ পত্রিকা পড়তে চাইলে যে-কোনো স্মার্ট ফোনে গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে Nobarun লিখলেই নবারুণ মোবাইল অ্যাপ আইকন আসবে। অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিলেই প্রতিটি সংখ্যা পড়তে পারবে একদম সহজে।

জাতীয় শিশু দিবস ও বঙ্গবন্ধুর শিশু আইন

র ফি কু র র শী দ

আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছিল শিশুর মতো সরল প্রাণ ও আবেগ ভরা সহজ হৃদয়। শিশুদের তিনি ভালোবাসতেন বুকের মমতা দিয়ে, নিবিড়ভাবে। রাষ্ট্রনায়ক হবার পরও একটুখানি সময় সুযোগ পেলেই তিনি শিশুদের সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশতেন, অপার আনন্দ পেতেন, নতুন কাজের উদ্দীপনা লাভ করতেন। শিশুসঙ্গ ছিল তাঁর কাছে অফুরন্ত প্রেরণার উৎসভূমি। ফুলের মতো ফুটে থাকা বিচিত্র সব শিশু মুখের দিকে তাকিয়ে এই মহান নেতা বাংলার ভবিষ্যৎ দেখতেন। তিনি প্রবলভাবে বিশ্বাস করতেন– আজকের শিশুই আগামী দিনের রাষ্ট্রনেতা, সমাজনেতা, কবি- সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, অধ্যাপক, প্রকৌশলী, চিকিৎসক, কৃষিবিদ, চিন্তাবিদ।

তিনি মনে করতেন প্রত্যেক শিশুর ভেতরেই আছে অপরিমেয় সম্ভাবনা। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হচ্ছে সেই সম্ভাবনার পরিপূর্ণ বিকাশের অনুকূল পরিবেশ রচনা করা এবং সেটা করা উচিত রাষ্ট্রের স্বার্থেই। এই সব বিকশিত প্রতিভার গৌরবে গর্বিত হবে রাষ্ট্র, তাদের সেবা অবদানে ধন্য হবে রাষ্ট্র। কাজেই রাষ্ট্রকেই এগিয়ে আসতে হবে শিশুবান্ধব এবং প্রতিভা বিকাশে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টিতে। শিশু অধিকার রক্ষা এবং প্রতিষ্ঠায় রাষ্ট্রকেই যথাযথ ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে।

হাজার বছরের শোষিত বঞ্চিত বাঙালি জাতির বুকের গভীরে লালিত স্বাধীনতার স্বপ্নসাধ মুকুলিত শুধু নয়, প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে ইতিহাসের মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে। তাঁরই হাত ধরে ১৯৭১ সালে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ। বাতাসে বারুদের গন্ধ। পরিত্যক্ত বাড়িঘর অগ্নিদগ্ধ। অনাবাদি ফসলের মাঠ। দীর্ঘ নয় মাস পরে এরই মাঝে এল স্বাধীনতা। মানুষের পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই, নিরাপদ আশ্রয় নেই।

কোথায় চিকিৎসা! কোথায় বা শিক্ষা! সব কিছু ভেঙে পড়েছে বাংলাদেশে। তবু স্বাধীনতা এসেছে অবশেষে। যুদ্ধের এই ভয়াবহ পরিণতিতে যে-কোনো বিবেকবান মানুষই স্তম্ভিত এবং আতঙ্কিত না হয়ে পারে না। মানবেতর এই পরিস্থিতি মোকাবিলা করে শিশুরা টিকে থাকবে কেমন করে! আর শিশুরাই যদি অপুষ্টির শিকার হয়, বিকলাঙ্গ হয়ে পড়ে, অসুস্থ থাকে, তাহলে সেই জাতি উঠে দাঁড়াবে কার ভরসায়? সে জাতির ভবিষ্যৎ অন্ধকারাচ্ছন্ন বলাই চলে। বাংলাদেশের বিজয় লাভের পর ১৯৭২ সালে পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে দেশের মাটিতে পা রাখতেই বঙ্গবন্ধু আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে কান্নায় ভেঙে পড়েন। চারপাশে তাকিয়ে তিনি চমকে ওঠেন– এই কি তাঁর সোনার বাংলা! তাঁর দু'চোখ ভরে ওঠে অশ্রুজলে।

গোটা জাতি অধীর আগ্রহে তাকিয়ে আছে জাতির পিতার মুখের দিকে। প্রবল আত্মবিশ্বাস আর সাহসিকতার সঙ্গে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন দেশের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন তিনি। পুরানো ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠে বাংলাদেশের সংগ্রামী জনগণ যেন আত্মমর্যাদার সঙ্গে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারে, দু'হাতে জঞ্জাল সরিয়ে স্বাধীন এই ভূখণ্ডকে যেন শিশুর নিরাপদ বাসস্থানে পরিণত করা যায়, সেই লক্ষ্যে কাজ শুরু করেন বঙ্গবন্ধু এবং তাঁর সরকার। স্বল্পতম সময়ের মধ্যে জাতীয় সংসদে গৃহীত হয় স্বাধীন দেশের প্রথম সংবিধান। সেখানে মর্যাদার সাথে ঘোষিত হয় শিশু অধিকারের কথা। বাংলাদেশের নতুন সংবিধানের ২৮(৪) ধারায় শিশুর উন্নয়ন ও তাদের ভবিষ্যৎ গড়ার কথা যথাযথ ভাবে স্থান দেওয়া হয়। শুধু তা-ই নয়, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আন্তরিক আগ্রহ এবং উৎসাহের কারণে ১৯৭৪ সালে এই দেশে প্রণয়ন করা হয় জাতীয় শিশু আইন। স্মরণ করা যেতে পারে যে, বাংলাদেশে এই আইনটি যখন প্রণয়ন ও পাস হচ্ছে, জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ তখনো অনুমোদিত হয়নি। সেটি হয় ১৯৮৯ সালে। পরের বছর, অর্থাৎ ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ সেই আন্তর্জাতিক সনদেও স্বাক্ষর করে। বরং একটু গর্বের সঙ্গেই বলা যায় জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদে প্রথম স্বাক্ষরকারী ২২টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। মজার ঘটনা হচ্ছে, জাতিসংঘ অনুমোদিত এই আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদে বর্ণিত বিষয়বস্তুর অনেক কিছুই ১৯৭৪ সালে প্রণীত বাংলাদেশের শিশু আইনের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। আসলে বাঙালির নেতা বঙ্গবন্ধু শিশু অধিকারের প্রশ্নে ছিলেন অধিকতর আধুনিক ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পন্ন।

বঙ্গবন্ধু প্রণীত বাংলাদেশের শিশু আইনের নেপথ্যে যেমন আছে বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের বিপর্যস্ত প্রেক্ষাপট, জাতিসংঘ অনুমোদিত শিশু অধিকার সনদ প্রণয়ন ও প্রস্তুতির পেছনেও তেমনি রয়েছে দু'দুটো বিশ্বযুদ্ধের অভিশপ্ত প্রেক্ষাপট। যুদ্ধ থেমে গেলেও তার তাণ্ডব চিহ্ন রয়ে যায়। সে চিহ্ন বেশি করে বয়ে চলে শিশুরা। মা-বাবা হারিয়ে কেউ এতিম হয়েছে, হাত-পা হারিয়ে কেউ বা পঙ্গু, বারুদের বিষক্রিয়ায় অসুস্থ অনেক শিশু। শিশুরাই যদি জাতির ভবিষ্যৎ হয়, তাহলে এই সব বিপন্ন মানব শিশুকে বাঁচাতে হবে, মানবিক মর্যাদাপূর্ণ জীবনের সন্ধান দিতে হবে। মহৎ এই ভাবনা থেকেই এগিয়ে আসে বিশ্ববিবেক। ১৯৫২ সালে 'শিশু কল্যাণ ইউনিয়ন' এর উদ্যোগে বিশ্ব শিশু দিবস পালনের প্রস্তাব উত্থাপিত হলেও ১৯৫৩ সালের ৫ই অক্টোবর বিশ্বের ৪০টি দেশে এ দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। ১৯৫৪ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে শিশু অধিকার ঘোষণা গৃহীত হয় এবং সারা বিশ্বে দিবসটি পালনের দায়িত্ব দেওয়া হয় ইউনিসেফকে। তারই ধারাবাহিকতার সঙ্গে যুক্ত হয় বাংলাদেশও। এদিকে সার্কভুক্ত দেশগুলো ১৯৯০ থেকে ১৯৯৯ সাল পর্যন্ত দশকটিকে 'সার্ক কন্যাশিশু দশক' হিসেবে উদযাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এর ফলে কন্যাশিশুর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্যমূলক আচরণ দূরীকরণে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হয়। সম্প্রতি যোগ হয়েছে অটিজম বা প্রতিবন্ধী শিশুদের মানবিক বিকাশে প্রয়োজনীয় সচেতনতা সৃষ্টির উদ্যোগ।

সুখের কথা, শিশু অধিকার প্রতিষ্ঠার এই সামাজিক আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায়ে বাংলাদেশ অত্যন্ত

গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছে। ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু যে শিশু আইন উপহার দিয়ে যান, পরবর্তীতে তারই আলোকে প্রণীত জাতীয় শিশুনীতি-২০১১ শিশুর সার্বিক দিক বিবেচনায় এনে শিশুর সামগ্রিক উন্নয়ন ও বিকাশের কথা বলা হয়েছে। এই শিশুনীতিতে অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া প্রতিরোধসহ ২০১৪ সালের মধ্যে নিরক্ষরতা দূরীকরণের প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়েছে।

সেই ১৯৭৪ সালে বঙ্গবন্ধু জাতীয় শিশু আইন প্রণয়নের মধ্য দিয়ে শিশুর প্রতি মনোযোগ ও কর্তব্যবোধ জাগিয়ে দিয়েই তাঁর দায়িত্ব শেষ করেননি, শিশুদের আহার-বাসস্থান-চিকিৎসা ভাবনার পাশাপাশি দেশে প্রাথমিক শিক্ষা জাতীয়করণের মাধ্যমে সকল শিশুর জন্য উন্মুক্ত করে দেন শিক্ষার দুয়ার। অবৈতনিক শিক্ষার সাথে সাথে বিনামূল্যে পাঠ্যবই প্রাপ্তির নিশ্চয়তা মূলত এ উদ্যোগে নতুন মাত্রা যুক্ত করে। তারই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বর্তমান সরকার আবারও দেশের বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোকে জাতীয়করণ করেন, বছরের শুরুতেই মাধ্যমিক পর্যন্ত বিনামূল্যে বই বিতরণের ব্যবস্থা করেন এবং সর্বোপরি ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের শিক্ষার্থীদের নাগালের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে কম্পিউটার ও আধুনিক ই-মেইল প্রযুক্তি।

দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক অংশই শিশু। কাজেই শিশুর ভবিষ্যৎ মানেই দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ। মনে রাখতে হবে–আহার, বাসস্থান শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের পাশাপাশি সুস্থ বিনোদনে বেড়ে ওঠার অধিকার নিশ্চিত করাও সকল শিশুর পরিপূর্ণ বিকাশের স্বার্থে অত্যন্ত জরুরি। প্রত্যেক শিশুর মধ্যেই সৌন্দর্যবোধ এবং শিল্পী মন থাকে। আধুনিক প্রযুক্তির সঙ্গে শিশুকে যুক্ত করার পাশাপাশি তার অন্তরের গভীরের সুপ্ত কোমল সত্তাকে জাগিয়ে তুলতে পারলে তবেই হবে শিশুর সুষম বিকাশ। অবশ্য এ জন্য শুধু রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের দিকে তাকিয়ে থাকলে হবে

না, পারিবারিক পরিচর্যা ও সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। তাহলেই নতুন শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার যোগ্য নাগরিক গড়ে উঠবে বাংলাদেশের শিশুদের মধ্যে থেকে। এরাই গড়ে তুলবে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা। শিশুদের গভীরভাবে ভালোবাসতেন বলেই বঙ্গবন্ধু তাঁর জন্মদিনে কচিকাঁচার আসর, খেলাঘর প্রভৃতি শিশু সংগঠনের শিশুদের সঙ্গে মিলেমিশে আনন্দ করতেন, শিশুদের চোখের গভীরে দেখতেন বাংলার ভবিষ্যৎ। আজ তিনি আমাদের মাঝে নেই। এ দেশের শিশুদের নিয়ে তাঁর যে স্বপ্ন ছিল তা বাস্তবায়ন করতে হলে সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে। সবাই মিলে এই রাষ্ট্রকেই করে তুলতে হবে শিশুবান্ধব রাষ্ট্র। তবেই হবে জাতীয় শিশু দিবস পালনের সার্থকতা।

শিশুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও সচেতনতা সৃষ্টির জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়েও শিশু দিবস পালন করা হয়। এর পাশাপাশি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ একান্ত নিজেদের মতো করেও পালন করে শিশু দিবস। বাংলাদেশে জাতীয় শিশু দিবস পালিত হয় ১৭ই মার্চ, বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিনে। এরকম ভাবে শিশু দিবস নির্ধারনের দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আরো অনেক দেশেই আছে।

> জাতিসংঘ অনুমোদিত এই আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদে বর্ণিত বিষয়বস্তুর অনেক কিছুই ১৯৭৪ সালে প্রণীত বাংলাদেশের শিশু আইনের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায়। আসলে বাঙালির নেতা বঙ্গবন্ধু শিশু অধিকারের প্রশ্নে ছিলেন অধিকতর আধুনিক ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন।

আন্তর্জাতিক ভাবে অক্টোবর মাসের প্রথম সোমবার বিশ্ব শিশু দিবস ও শিশু অধিকার সপ্তাহ পালন করা হয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশ জাতীয়ভাবে তাদের গুরুত্বপূর্ণ কোনো দিবসকে শিশু দিবস হিসেবে পালন করে থাকে। প্রতি বছর জুনের দ্বিতীয় রবিবার আমেরিকায়, ১লা জুলাই পাকিস্তানে, ৪ঠা এপ্রিল চীনে, ব্রিটেনে ৩০শে আগস্ট, জাপানে ৫ই মে, জার্মানিতে ২০শে সেপ্টেম্বর, ভারতে ১৪ই নভেম্বর (প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর জন্মদিন) এবং এ রকম আরো বিভিন্ন দিন বিভিন্ন দেশে জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালিত হয়। তবে সব দেশেই শিশু দিবস পালনের উদ্দেশ্য একটাই– দেশের শিশুদের অধিকার ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বার্তা দেওয়া। বাংলাদেশে আন্তর্জাতিক বা বিশ্ব শিশু দিবস পালন করা হলেও জাতীয় শিশু দিবস ছিল না। এই অভাব পূরণে ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের পর যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করে। সেই সরকারের মন্ত্রিসভা জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জন্মদিন ১৭ই মার্চ জাতীয় শিশু দিবস দিবস হিসেবে ঘোষণা করে এবং ১৯৯৭ সাল থেকে দিবসটি পালিত হয়। এ দিনটি সরকারি ছুটি ঘোষিত হয়। বঙ্গবন্ধু নিজে কখনো নিজের জন্মদিন পালন করতে পছন্দ করতেন না। জন্মের এই দিনটিতে শিশুদের সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশে আনন্দ করে কাটাতে ভালোবাসতেন। শিশুদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং দায়িত্ববোধের স্বীকৃতি হিসেবে তাঁর জন্মদিন ১৭ই মার্চকে জাতীয় শিশু দিবসের মর্যাদা দান, মূলত শিশু দরদী জাতির পিতার প্রতি গোটা জাতির শ্রদ্ধা নিবেদন বলে গণ্য করা যায়। এই দেশকে শিশুবান্ধব দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে পারলে তবেই এই শ্রদ্ধা নিবেদন পূর্ণতা পাবে এবং জাতীয় শিশু দিবস পালনও সার্থক হবে। ■

শিশু সাহিত্যিক

শেখ মুজিব আজ ধ্রুবতারা

মোনায়েম সরকার

মহান নেতা শেখ মুজিবুর
বাংলার সন্তান,
বাংলাদেশের স্বাধীনতা
তাঁর অমূল্য দান।

শৈশব থেকে সাহসী সে যে
বিশাল হৃদয় তাঁর,
কখনোই তাঁকে কোনো কারণে
মানতে হয়নি হার।

জেলের ঘানি টেনেছে সে যে
বছরের পর বছর,
তবুও কখনো কমেনি তাঁহার
সিংহ-মনের জোর।

বাংলাদেশের পথে প্রান্তরে,
শোনা যায় তাঁর স্বর,
এদেশের প্রতি ঘর যেন আজ
শেখ মুজিবের ঘর।

পঁচাত্তরের পনেরো আগস্ট
হায়, কী ভয়াল রাত!
যমদূতেরা বাড়িয়ে দিল
লোমশ কালো হাত।

কিছু ঘাতক করল গুলি
শেখ মুজিবের বুকে,
কালো ছায়া পড়ল এসে
বাংলাদেশের মুখে।

নাম নেওয়া তাঁর নিষেধ হলো,
সঙ্গী ছিল যাঁরা,
তাঁদের রক্তে ভেসে গেল
আঁধার রাতে কারা।
কেউ ভাবেনি ভেদ করে সেই
রাতের কালো আঁধার,
শেখ মুজিবের স্বপ্ন- আলোয়
ভরবে এদেশ আবার।

এখন তাঁহার নাম শোনা যায়
উত্তর-দক্ষিণে,
এই পৃথিবীর কে না এখন
শেখ মুজিবকে চিনে?

আদর্শ তাঁর দিনে দিনে
হচ্ছে আরও উচ্চ,
তাঁর কাছে আজ অনেক কিছুই
বিবর্ণ আর তুচ্ছ।

শেখ মুজিবুর এখন শুধু 'বঙ্গবন্ধু' নয়,
'বিশ্ববন্ধু' এখন তাঁহার নতুন পরিচয়।

শত বছরের শেষেও তিনি
জ্বলজ্বলে মহীয়ান,
পৃথিবীর বুকে মুজিবুর এক
মৃত্যুঞ্জয় প্রাণ।

ধন্য বাংলা, ধন্য বাঙালি, পেয়ে এমন নেতা,
শেখ মুজিবুর বাংলাদেশের উন্নত-শির পিতা।

বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ভাষণ ও স্বাধীনতার ঘোষণা

আপন চৌধুরী

১৯৭০ সালের ৭ই নভেম্বরের জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করলেও সামরিক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চাচ্ছিল না। মিছিল-মিটিং সমাবেশের পর চাপের মুখে ৩রা মার্চ জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশনের তারিখ ঘোষণা করেন। এরপর পহেলা মার্চ দুপুরে সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান বেতার ভাষণে আসন্ন ৩রা মার্চের জাতীয় পরিষদের প্রথম অধিবেশন স্থগিত করলে ছাত্র-জনতা বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তখন কারো বুঝতে বাকি থাকল না সামরিক জান্তার উদ্দেশ্য। তারা সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চাইছে না। দুপুরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিশাল জনসমাবেশ হলো পল্টন ময়দানে। ঢাকা স্টেডিয়ামে তখন ক্রিকেট খেলা চলছিল। উত্তেজিত জনতার চাপের মুখে খেলা স্থগিত হয়ে যায়। বঙ্গবন্ধু তখন মতিঝিলস্থ হোটেল পূবাণীতে আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারি বোর্ডের মিটিংয়ে ছিলেন। সারা ঢাকা তখন মিছিলের শহরের পরিণত হয়। ছাত্র-জনতাসহ সকল উত্তেজিত জনতা মিছিল নিয়ে হোটেল পূর্বাণীর দিকে এগুতে থাকে। পূর্বাণীর সামনে কায়েদে আজমের ছবি ও পাকিস্তানের চাঁদ তারা খচিত পতাকা পোড়াতে থাকে। ছাত্র-জনতা স্লোগান দিতে থাকে, 'বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো বাংলাদেশ স্বাধীন

করো'। এই প্রথম ছাত্র-জনতার মুখে স্বাধীনতার স্লোগান। বঙ্গবন্ধু তাৎক্ষণিক হোটেল পূর্বাণীতে সংবাদ সম্মেলনে বলেন- এই ঘোষণা সম্পর্কে তিনি কিছুই জানেন না। তবে তিনি এ ধরনের একটি ঘটনা আগে থেকেই আশঙ্কা করেছিলেন এবং ঘোষণা দেন আগামী ৭ই মার্চ রেসর্কোস ময়দানের জনসভায় সব বলবেন। এদিনই ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক আহুত পল্টন ময়দানের তাৎক্ষণিক জনসভায় বঙ্গবন্ধু প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য দেন এবং ২রা মার্চ ঢাকায় ও ৩রা মার্চ থেকে ৬ই মার্চ পর্যন্ত সারা দেশে হরতাল ঘোষণা করেন। তিনি ভবিষ্যৎ নির্দেশনা ৭ই মার্চের রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) দিবেন বলে জানান। উল্লেখ্য যে, এটাই ছিল পল্টন ময়দানে বঙ্গবন্ধুর জনসভার শেষ ভাষণ। পহেলা মার্চ রাতে বঙ্গবন্ধুর বাসভবনে যারা তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন তাঁরা হলেন-জাতীয় দলের আতাউর রহমান খান, জমিয়তে ওলামা-এ-ইসলামের সভাপতি মাওলানা শাহনূরানীসহ অনেকেই।

২রা মার্চ ঢাকায় হরতাল পালিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করা হয়। সারা বাংলাদেশ তখন আন্দোলনে উত্তপ্ত। ২রা মার্চ হতে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর (বঙ্গবন্ধুর বাসভবন) থেকে প্রতিদিন বিকালে প্রেস কনফারেন্স ও প্রেস বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সারা দেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও রাজনৈতিক নির্দেশনামা পরিবেশিত হত। বাঙালি জাতি সেই নির্দেশনার মধ্যেই নিজেদের ভবিষ্যত পরিকল্পনা তৈরি করত। সারা দেশের মানুষ তখন বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় আন্দোলনরত। ৩রা মার্চ সারা দেশে সর্বাত্নক হরতাল পালিত হয়। ওইদিন ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক বাংলাদেশের প্রথম পতাকা উত্তোলন করা হয় এবং স্বাধীনতার ইশতেহার পাঠ করা হয়। ঢাকা তখন রাজনৈতিক উত্তাপে উত্তপ্ত নগরী। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১১০ নাম্বার সামরিক আইন জারী করেন এবং দুপুরেই ঢাকার রাজপথে সেনাবাহিনীর টহল দেখা যায়। প্রকারান্তরে পাকিস্তানের অবিভক্ততা ও সার্বভৌমত্বের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ ও প্ররোক্ষভাবে নিষেধাজ্ঞা জারী করে। নিষেধাজ্ঞার তোয়াক্কা না করে জনগণ স্ব-ইচ্ছায় রাস্তায় নেমে আসে। ওইদিনই সেনাবাহিনীর গুলিতে ঢাকায় তাজুল হক ও আমানুল্লাহ নামে ২ জন নিহত হয়। আহত প্রায় শতাধিক। বঙ্গবন্ধু ওইদিন ঘোষণা দেন যে সরকারকে খাজনা ও কর না দেওয়ার জন্য। ছাত্রনেতা ইকবাল ৩রা মার্চ মালিবাগে সেনাবাহিনীর গুলিতে নিহত হন। বেতারে প্রচার হলো ১০ই মার্চ ইয়াহিয়া খান ঢাকায় আসবেন। বঙ্গবন্ধু এই খবর প্রত্যাখ্যান করেন এবং ঘোষণা করেন ৭ই মার্চের ভাষণে যা কিছু বলার বলবেন। নতুন নতুন স্লোগানে মুখরিত সারা দেশের রাজপথ।

৪ঠা মার্চের হরতালে সারা দেশের জনগণ অভাবনীয় সাড়া দেয়। দেশের বেসামরিক শাসন ব্যবস্থা পুরোপুরি অকার্যকর হয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষের সমর্থন থাকায় রিকশাও ছিল হরতালের আওতায়। ৪ঠা মার্চ জানা যায় সাদা পোশাকে করাচি থেকে মিলিটারি ঢাকায় আসছে। গুলি হলো খুলনা ও চট্টগ্রামে। জনগণও প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে। ৪ঠা মার্চ নাগাদ সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, আদালত, শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বাস, রেল, স্টিমার, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসহ সব বন্ধ হয়ে যায়। কার্যত অচল হয়ে পড়ে পুরো বাংলাদেশ। ৫ই মার্চ হরতালে টঙ্গীতে গুলি করে ৪ জনকে হত্যা করা হয়। আহত হয় অনেকে। ঢাকার রাজপথে মহিলাদের মিছিল। আওয়ামী লীগের কন্ট্রোল রুম স্থাপিত হলো ৫১ নম্বর পুরানা পল্টনে। সারা দেশের সাথে টেলিফোনের মাধ্যমে যোগাযোগ চলতে থাকে। ৫ই মার্চ পর্যন্ত সেনাবাহিনী ও বিহারিদের মাধ্যমে ১৩৮ জন বাঙালি নিহত হবার খবর পাওয়া যায়। কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে প্রায় সাড়ে তিনশ কয়েদি জেল ভেঙে মিছিল করে শহিদমিনারে চলে আসে। জেল ভাঙার সময় জেল পুলিশের গুলিতে ৭ জন কয়েদি নিহত হয়। পুরো বাংলাদেশ তখন বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে পরিচালিত হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে ৬ই মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বেতার ভাষণে ২৫শে মার্চ ঢাকায় জাতীয় পরিষদের অধিবেশন পুনঃ আহবান করেন এবং বাঙালিদেরকের শাসিয়ে বলেন যে, 'সরকার যে-কোনো মূল্যে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা করবে'। বেতার ও টেলিভিশনে আওয়ামী লীগ ও

মুক্তিযুদ্ধের খবরাখবর প্রচারিত হতে থাকে। মুক্তিকামী বাঙালি বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় আন্দোলনরত।

সংগ্রামী জনতা ৭ই মার্চ সকাল থেকে রেসকোর্স ময়দানে (সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) জড়ো হতে থাকে মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পূর্ব নির্ধারিত ভাষণ শোনার জন্য। লাখ লাখ জনতা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে বঙ্গবন্ধুর দিক-নির্দেশনামূলক ভাষণ শুনতে। এক সময় বিশ্বরাজনীতির মহাকবি বঙ্গবন্ধু ঘোষণা করেন অমর কবিতাখানি- 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। যার যা আছে তাই নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দিলেন। ৭ই মার্চের এই ঘোষণার মাধ্যমে মুক্তিকামী বাঙালি স্বাধীনতার মন্ত্রে উজ্জীবিত হলো। মূলত ৭ই মার্চের ভাষণ ছিল বাঙালিদের মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের ঘোষণা। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণ ওইদিন বেতারে প্রচার না হয়ে ৮ই মার্চ প্রচারিত হয়। সারা দেশের মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুপ্রেরণা পায়। ইতোমধ্যে সারা দেশে স্বাধীন বাংলার পতাকা উড়তে শুরু করেছে। জানা গেল পাকিস্তান থেকে হাজার হাজার সেনাবাহিনী ও পুলিশ এসেছে আন্দোলন দমন করার জন্য। মুক্তিকামী জনতা সারা দেশে বঙ্গবন্ধুর নির্দেশনায় মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঢাকাসহ সারা দেশে আন্দোলন দমনের নামে পুলিশ ও মিলিটারি গুলি চালাচ্ছে। ২৫শে মার্চ সামরিকজান্তা সরকার অপারেশন সার্চলাইট নামক বাঙালি নিধন কার্যক্রম শুরু করে। ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বঙ্গবন্ধু গ্রেফতার হওয়ার পূর্বমুহূর্তে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে যান। এরপর বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানের নির্জন কারাগারে বন্দি করে রাখা হয়। বাঙালি জাতি তখন মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ■

কথা সাহিত্যিক

পঁচিশের সেই কালো রাত

মোহাম্মদ আহছান উল্লাহ

যুদ্ধ মনে পড়ে!
মনে পড়ে পঁচিশের সেই কালরাত
তুমি তখন ছোটো ছিলে
ছিলে দুধের বাচ্চার মতো কোলে পিঠে।
তোমার চিৎকার
চারদিকে প্রচণ্ড গুলির আওয়াজ
শত চেষ্টাতেও ঘুম পাড়াতে পারিনি
তুমি ছিলে জীবন শঙ্কা
তুমি বড়ো হয়েছ স্বাধীন হয়েছে এ দেশ।
মেঘলা আকাশে আলোর ঝিলিমিলি
বাংলার মাঠঘাট-প্রান্তর
চাকচিক্য আনন্দে প্রসারিত
জেগে উঠছে বিজয়ের আনন্দ উৎসব।
উন্নয়নের বাতাস বয়ে চলেছে
চারদিকে দিগন্ত ছুয়ে...।

স্বাধীনতার ডাক

শিবুকান্তি দাশ

স্বাধীনতার ডাক দিল কে
যোদ্ধা ছিল কারা
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর
বজ্রকণ্ঠের সাড়া।
বাংলা মায়ের দামাল ছেলে
স্নেহময়ী বোন
স্বাধীনতার যোদ্ধা তারা
কানটা পেতে শোন।
সাতই মার্চ রেসকোর্সে
প্রথম দিলেন ডাক
পঁচিশ মার্চ মধ্যরাতে
বন্দি করে পাক।
তখন পিতা স্বাধীনতার
দিলেন মহাবাণী
এ কথাটা ইতিহাসে
আজও সঠিক জানি।

লড়াই

সোহরাব পাশা

একাত্তরে হায়েনারা
হামলে পড়ে ঘাড়ে
প্রাণ বাঁচাতে বাঙালিরা
ঘরবাড়ি সব ছাড়ে,

মায়ের মুখের নিভলো হাসি
ভিজলো দু-চোখ জলে
ভাবছে কেবল তার ছেলেরা
ফিরবে কোন ছলে;

শহিদ হলো মুক্তিসেনা
দেশটা স্বাধীন করতে
শেষ লড়াইটা লড়তে হবে
সোনার এদেশ গড়তে।

স্বপ্নের স্বাধীনতা

আকলিমা চৌধুরী

দীর্ঘ ন'মাস যুদ্ধ করেই
পেয়েছি এ স্বাধীনতা-
এই স্বাধীনতা তিরিশ লক্ষ
জীবনের ইতিকথা।

লাখো শহিদের রক্তে ভিজেছে
মাতৃভূমির মাটি...
মুক্তিসেনারা উড়িয়ে দিয়েছে
শত্রুসেনার ঘাঁটি।

এই স্বাধীনতা এমনি আসেনি
অনেক ত্যাগের পাওয়া...
হাজার যুগের নিপীড়ন শেষে
মুক্তির গান গাওয়া।

সহস্র কালের গভীরতা থেকে
জেগে ওঠে মহানেতা...
তার আঙুলের নির্দেশে জাতি
হলো যে স্বাধীনচেতা।

মানুষ ছুটেছে সেই নির্দেশে
অস্ত্র উঁচিয়ে হাতে...
মহা বিজয়ের লক্ষ্যে বীরেরা
লড়েছে আঁধার রাতে।

এভাবেই হলো রচিত জাতির
স্বপ্নের জয়গাথা;
রক্ত আখরে লেখা আমাদের
স্বপ্নের স্বাধীনতা।

স্মৃতিসৌধ

মির্জা আয়েশা সিদ্দিকা ত্বাহা

আগুন ঝরা মার্চ এলোরে
আগুন ঝরা মার্চ
এমন দিনে পাকসেনারা
করল বাংলা চার্জ।

সেই ভয়াবহ দিনের কথা
শুনে দাদুর মুখে
মস্ত একটা পাথর চাপা
পড়ল আমার বুকে।

লক্ষ-কোটি লাশের মূল্যে
পেলাম সোনার দেশ
স্বাধীনভাবে লিখি পড়ি
সুখেই আছি বেশ।

আছো যত বীর বাঙালি
শিশু - কিশোর দল
বীরসেনাদের সালাম দিতে
স্মৃতিসৌধে চল।

স্বাধীনতা দীপ্ত অহংকার

মুহাম্মদ ইসমাঈল

স্বাধীনতা সবুজ - শ্যামল মাঠের ফসল
স্বাধীনতা মাতৃক্রোড়ে আধো আধো বোল
স্বাধীনতা বাগিচার রঙিন প্রজাপতি
স্বাধীনতা সবার অবাধ চলার গতি।

স্বাধীনতা মুক্তিযোদ্ধার আত্মাহুতির ফল,
স্বাধীনতা বাঙালি জাতির শক্তি-সাহস বল
স্বাধীনতা সস্তা দামে না কেনা কোনো পণ্য
স্বাধীনতা হারিয়ে যাওয়া অধিকার আদায়ের জন্য।

স্বাধীনতা ফুল-কাননের সদ্য ফোটা ফুল,
স্বাধীনতা পেয়ে আজি ধন্য জাতি কুল।
স্বাধীনতা বর্ষ ঘুরে আসে বারংবার
স্বাধীনতা সোনার বাংলার দীপ্ত অহংকার।

স্বাধীনতার মর্ম

সালাম ফারুক

এখন তুমি ইশকুলে যাও,
পড়বে পরে ভার্সিটি;
খেলার সময় গায়ে জড়াও
লাল-সবুজের জার্সিটি।

মনের কথা বাংলাতে কও
লিখছ নিজের ভাষাতে,
ভাটিয়ালি সুরের তালে
নাও যে পারো ভাসাতে।

বড়ো হয়ে কিছু হওয়ার
করো কত কল্পনা,
এমন সুযোগ দিতে তোমায়
ত্যাগ যে ছিল অল্প না।

পাকিস্তানি শোষক যদি
রাখত এ দেশ শাসনে,
এমন স্বপ্ন দেখতে না কেউ
থাকতে পিছের আসনে।

যুদ্ধ করে বীর সেনারা
মুক্তি যদি আনত না,
স্বাধীনতার মর্মটা যে
বাঙালিরা জানত না।

স্বাধীনতার ডাক এসেছে

আল জাবিরী

বজ্র কঠিন শপথ নিয়ে
আয় তরুণ
আয়রে কিশোর-দামাল ছেলে
আয়রে শুন।

স্বাধীনতার ডাক এসেছে
খোলরে দোর
আঁধার টুটে আনতে হবে
আলোর ভোর।

সাহস বুকে থাকলে কারো
হয় কি হার?
ঊর্ধ্বে তোল মুষ্টিবদ্ধ
হাত তোমার।

দেশকে ভালোবাসি

রাজন বড়ুয়া

খাকি শার্ট পায়ে বুট
করছে কেমন হরিলুট।

গোলাগুলির শব্দ এলো
ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে গেল।

দুরুদুরু মায়ের বুক
করছে আহা ধুকপুক।

আর্তনাদের কান্না শুনে
দিনগুলো সব নিচ্ছি গুণে।

খাবে তারা দেশটা গিলে?
রুখতে হবে সবাই মিলে।

যুদ্ধে গেলাম আমরা সবে
দেশ স্বাধীন করতে হবে।

যুদ্ধে যুদ্ধে ন'মাস গেল
সবকিছুই এলোমেলো।

বাজল শেষে বিজয় বাঁশি
দেশকে মোরা ভালোবাসি।

গল্প

স্বাধীনতা তুমি

ড. শিল্পী ভদ্র

দশটা আম ভাগ করতে গিয়ে বিনি মা-কে বলল, একটা আমে একটু দাগ পড়েছে মা। আমটা কাকে দেব?

মা বললেন, বিনি সোনা, আম ভাগের দায়িত্ব যখন নিয়েছো। সেজন্য দাগ-পড়া আমটা তুমি নিলেই ভালো সমাধান হবে। হয়ত তুমি প্রশ্ন করতে পারো, কেন? আসলে খারাপ জিনিসটা অন্যকে দেওয়া যায় না। এখানে তোমাকে, সবাইকে আম ভাগ করে দেবার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। সে দায়িত্বের মান রাখতেই তোমাকে এমনটি করতে হবে। কারণ স্বাধীনতা মানেই যে সুশৃঙ্খলা, স্বাধীনতা মানেই আত্মত্যাগ। খারাপ আমটা তুমি নিলে ওদের কারও মন খারাপ হবে না। তুমিও তাতে ত্যাগের শান্তি পাবে। জানো মামনি, ত্যাগ করেই মনে প্রশান্তি আসে।

মা, তাহলে স্বাধীনতা পেলে কি যা খুশি তা করা যায় না?

নারে, তা তো যায়ই না। নিজে যা খুশি তাই করবে, তা হবে না। অন্যেরা যা ইচ্ছা তা করবে তাও না। অন্যের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে দাম দিতে হবে। না দিলে তা হবে গায়ের জোর।

তাহলে স্বাধীনতার অর্থ কী মা?

স্বাধীনতার অর্থ– তোমার কাছে সব ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তার সঠিক ব্যবহার করা। সংযত, সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করা। সবার ভালো চাওয়া। সবার মতামতে দাম দেওয়ার নাম স্বাধীনতা । ওই যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের– 'আমরা সবাই রাজা, আমাদের এই রাজার রাজত্বে' -গানটার মতো। সেখানে আছে– 'রাজা সবারে দেন মান, সে মান আপনি ফিরে পান'। তেমনি সবাইকে মান দিলে তুমিও মান পাবে। ভালো কাজগুলো যে একটা আরেকটার সাথে জড়িয়ে থাকে।

মা, আমরা তো এখন স্বাধীন বাঙালি জাতি। এই স্বাধীনতা লাভ করাও কি অনেক কঠিন হয়েছিল?

হ্যাঁ মামণি, আমরা অনেক কষ্ট করে, নয় মাসব্যাপী যুদ্ধ করে স্বাধীনতা অর্জন করেছি।

'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম'। বিনি হাত উঁচিয়ে বলে ওঠে।

মা হেসে বলেন, বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণ তোমার খুব প্রিয় জানি। এই ভাষণ মনের ভেতর বয়ে বয়েই তো আমরা স্বাধীন হয়েছি। তখন সেই ১৯৭১ সালে মানুষ রেডিও-ই শুনত। যুদ্ধের সময় বাঙালিদের স্বাধীনতা লাভের জন্য ঘর ছেড়ে বনে-জঙ্গলে ঘুরতে হতো। নানা প্রতিকূল পরিবেশে থাকতে হতো। এই রেডিওতে প্রচারিত অনুষ্ঠানগুলোই তখন তাদের প্রাণে আশা জাগিয়ে রাখত। তাতে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের অনুষ্ঠান প্রচারিত হতো। বঙ্গবন্ধুর ভাষণ ছিল তখন মুক্তিকামী বাঙালিদের যুদ্ধে প্রেরণার মূল উৎস। তোমার দাদা একজন মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন।

১১টি সেক্টরে আমাদের স্বাধীনতা যুদ্ধ হয়েছিল।

সেক্টর কী মা?

স্বাধীনতা যুদ্ধ জয়ের জন্য বাঙালিদের বিভিন্ন রণকৌশল গ্রহণ করতে হয়েছিল। এসব রণকৌশলেরই একটা পদক্ষেপ ছিল সেক্টর ভাগ। পুরো বাংলাদেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল। এই ভাগ করায় যুদ্ধ পরিচালনার কাজ অনেক সহজ হয়। তোমার দাদা এরই ৮নং সেক্টরে ছিলেন। সেসময় তোমার বাবা ছোটো ছিলেন। তোমার দাদা যুদ্ধে চলে যান। যাবার আগে তোমার দাদি, তোমার বাবা আর আন্টিকে, দাদির বাবার বাড়ি রেখে যান।

দাদির বাবার বাড়ি তো ফরিদপুরের নগরকান্দায়?

হ্যাঁ। তাদের রেখে যাবার সময় উনি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর হাতে সপরিবারে ধরা পরেন।

তাই নাকি মা! তারপরে কী হয়?

তোমার দাদা জানতেন এমনটি হতে পারে। তাই তিনি বুদ্ধি করে আগেই ওদের কিছু উর্দু কথা শিখিয়ে রেখেছিলেন। পাকিস্তানি এক সৈন্য তোমার দাদাকে নাকি জিজ্ঞাসা করেন, কাহা যা রাহা হে?

পিতা বিমার হে। ইসলিয়ে হাম সব দেখনে যা রাহে হে।

ইতনে লোক কিউ?

উসকা শরীর বহুত খারাপ হ্যায়।

সৈন্যটির তাতেও সন্দেহ যায় না। একে একে সবার নাম জিজ্ঞাসা করেন। তোমার দাদা বলেন, মেরা নাম লিয়াকত আলি হ্যায়, তোমার দাদি বলেন, কুলসুম বেগম হ্যায় অর মেরা বেটা-বেটি সান্নু হ্যায়, পাচু হ্যায়।

আচ্ছা নাম হ্যায় বলে সৈন্যটি সবাইকে ছেড়ে দেন। বাংলা না বললে ওরা খুব খুশি হতো। সে যাত্রায় এভাবে তারা বেঁচে যান।

মা আমরা স্বাধীন না হলে উর্দু ভাষাতেই কথা বলতাম তাই না?

ঠিক তাই। তখন আর আমরা আমাদের মায়ের ভাষায় কথা বলতে পারতাম না। পরের ভাষায় কথা বলা যে কী কষ্টের! মনে কোনো শান্তি লাগে না। মনে হয় নিজের মনের ভাব ঠিকমতো অন্যকে বোঝাতে পারছি না। কথা বলে ভালো লাগে না, নিজেকে দুঃখী-দুঃখী লাগে।

তারপর কী হলো মা?

তারপর তোমার দাদির মুখে শুনেছি, তোমার দাদা যুদ্ধে চলে যান। যাবার পর তোমার দাদাকে নিয়ে তাদের চিন্তার শেষ ছিল না। কোথায় আছেন, কেমন আছেন। তেমন খোঁজখবরও পাওয়া যেত না। মাঝে মাঝে দু-একজন মুক্তিযোদ্ধার কাছে খবর পাঠাতেন তোমার দাদা। তোমার দাদির বাবা তাদের কাছে কিছু টাকা, শুকনো খাবার, জামাকাপড় পাঠিয়ে দিতেন। তাদের মাধ্যমে চিঠি দেওয়া-নেওয়াও হতো।

তাহলে তো দাদি, বাবা, আন্টিসহ সবারই অনেক কষ্ট হতো। আমার বাবা যেমন কিছুদিনের জন্য অফিসের কাজে বাইরে গেলে আমার কষ্ট হতে থাকে। আর নয় মাস!

তবু তো তোমার দাদা মাঝে মাঝে খবর পাঠাতেন। কিন্তু ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী গ্রেফতার করেন। এরপর তাকে করাচি থেকে নেওয়া হয় লাহোরের ৮০ মাইল দূরের ফয়সলাবাদের প্রধান কারাগার লায়ালপুর জেলে। লায়ালপুর পাকিস্তানের দুর্বিষহ, উষ্ণতম স্থান। এই কারাগারের নিঃসঙ্গ সেলে তারা বঙ্গবন্ধুকে আটক রাখে।

সে খবর কীভাবে জানা যায় মা?

১৯ই জুলাই ফিন্যান্সিয়াল টাইমস এর ছোট্ট খবরে পাকিস্তানি কারাগারে বঙ্গবন্ধুর আটকে থাকার কথা প্রকাশ হয়। এরপর ৩রা ডিসেম্বর সামরিক আদালতের বিচারে বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসির দণ্ড দেওয়া হয়। তারপর তাঁকে নেওয়া হয় পাঞ্জাবের মিয়ানওয়ালি জেলে। যে সেলে তিনি ছিলেন সেখানে তার জন্য কবরও খোঁড়া হয়। ভাবো, এ খবরে তার পরিবারের সবার মনের অবস্থা কেমন হয়েছিল? পিতা শেখ লুৎফর রহমানের চোখের মণি ছিলেন বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধুর মা (সায়েরা খাতুন), স্ত্রী (শেখ ফজিলাতুন্নেছা), তাঁর সব ছেলেমেয়ে– শেখ হাসিনা, শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রেহানা, শেখ রাসেলের কী অবস্থা হয়েছিল? এছাড়া তার ভাই-বোন, আত্মীয়স্বজন, দেশবাসী, বন্ধুবান্ধব। সবারই বঙ্গবন্ধুর জন্য ভীষণ চিন্তা হতে থাকে।

তারপর কীভাবে তিনি মুক্তি পান?

পাকিস্তানিরা তো ধরেই নিয়েছিলেন, বাংলাদেশ কোনোদিন স্বাধীন হবে না। এরপর ১৬ই ডিসেম্বরে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। তখন বিভিন্ন দেশ ও বিশ্বের মুক্তিকামী জনগণ বঙ্গবন্ধুর জীবনের নিরাপত্তার দাবি জানান। তারা স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ছেড়ে দেবার দাবি জানান। বিশ্ববাসীর চাপ আসে পাকিস্তান সরকারের উপর। তখন তারা বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন। এরপর ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন। সেজন্য ১০ই জানুয়ারি কে বলা হয় বঙ্গবন্ধুর 'স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস'।

আচ্ছা মা বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন কবে?

বঙ্গবন্ধু ১৯২০ সালের মার্চ মাসের ১৭ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধুর এই জন্মদিনকে বাংলাদেশে 'জাতীয় শিশু দিবস' হিসেবে পালন করা হয়। বঙ্গবন্ধু শিশুদের অত্যন্ত ভালোবাসতেন। আবার দেখো, এই মার্চ মাসের ২৬ তারিখেই বাঙালি জাতির স্বাধীনতা দিবস।

মা, ২৬শে মার্চ তো বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বন্দি করে নিয়েই যায়। তাহলে তিনি ২৬শে মার্চে কীভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন?

ভালো প্রশ্ন করেছ তুমি। পাকিস্তান সেনাবাহিনী ২৫শে মার্চ রাতে নিরস্ত্র বাঙালির ওপর নিষ্ঠুর হামলা শুরু করেন। এই গণহত্যা চলাকালে শেখ মুজিবুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন এই র তের ১২টা ২০ মিনিটে। রাত ১২টা ২০ মিনিট সময়কে ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহর ধরা হয়। তাই আমাদের স্বাধীনতা দিবস হচ্ছে ২৬শে মার্চ। আর ২৬শে মার্চের রাত ১টা ৩০ মিনিটে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী, বঙ্গবন্ধুকে গ্রেপ্তার করেন। তাই আমাদের স্বাধীনতা দিবস আর বঙ্গবন্ধুর গ্রেপ্তার ২৬শে মার্চেই হয়েছিল।

বাহ বেশ তো! আমাদের বঙ্গবন্ধুর জন্মমাস আর বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবসের মাস একই। পরের গল্পটা বলো না মা।

তারপর কত কঠোর সংগ্রাম, আত্মত্যাগ, অসম্মান, অত্যাচার, অবিচার, নির্যাতন হয়। অনেক সম্পদ, ফসল নষ্ট হয়। লক্ষ লক্ষ জীবন বলিদানের মধ্য দিয়ে আমরা ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বরে স্বাধীনতা অর্জন করি। স্বাধীনতার জন্য বাঙালি জাতির আত্মত্যাগ পৃথিবীর ইতিহাসে বিরল। তবে জেনো মামণি, স্বাধীনতা অর্জন করার পর স্বাধীনতার সম্মান রক্ষা করা আরও কঠিন কাজ।

মাগো, বঙ্গবন্ধুর কাছে আমরা ঋণী। তাঁর এবং অসংখ্য বাঙালির মহৎ আত্মত্যাগের জন্যই আমরা আজ স্বাধীন জাতি। আর তোমার কাছ থেকে শিখলাম স্বাধীনতা রক্ষা করা। নিজের স্বার্থত্যাগ করা। নিজে স্বাধীনভাবে চলতে পারছি বলেই যা ইচ্ছা তা না-করার নাম, প্রকৃত স্বাধীনতা।

মামণি, নিজেকে সুন্দর জীবনের দিকে নিয়ে যাওয়ার স্বাধীনতা সকলের আছে। স্বাধীন জাতি হিসেবে, সুন্দর জীবন গড়ে তুলবে। তাহলেই প্রকৃতভাবে স্বাধীনতার মান রক্ষা করা হবে। তোমার পরিবার, সমাজ, দেশ, জাতি উপকৃত ও উন্নত হবে। তখনই বাঙালি জাতি হিসেবে তোমার জীবন সার্থক হবে।

: মা আমি আবার বঙ্গবন্ধুকে নতুন করে চিনলাম। কৃতজ্ঞতায় আমি মন থেকে তাঁকে শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা জানাই। ■

গবেষক ও প্রাবন্ধিক

মো. আ. রাজ্জাক সরকার, দশম শ্রেণি, ঢোলডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, গাইবান্ধা

জাতীয় সংগীতের অর্কেস্ট্রা ভার্সন

ইউটিউবে সার্চ দিলে পৃথিবীর অনেকগুলো দেশের জাতীয় সংগীতের অর্কেস্ট্রা ভার্সন খুঁজে পাওয়া যাবে, কিন্তু বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের এমন কোনো ভার্সন খুঁজে পাওয়া যায়নি। অবশেষে সেই উদ্যোগটা নিয়েছেন সুস্মিতা আনিস। ইউরোপের স্বনামধন্য বেশ কিছু অর্কেস্ট্রা আর্টিস্টকে নিয়ে প্রায় দীর্ঘ এক বছর প্রচেষ্টার পর তৈরি করেছেন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীতের এই অর্কেস্ট্রা ভার্সন। বিজয়ের ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের মহান জাতীয় সংগীতের অর্কেস্ট্রা ভার্সন প্রকাশিত হয়েছে। ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে আমার সোনার বাংলা গানটি রচিত হয়েছিল। ১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগরে স্বাধীন বাংলাদেশের সরকারের শপথ অনুষ্ঠানে এই গান প্রথম জাতীয় সংগীত হিসেবে গাওয়া হয়। ১৩ই জানুয়ারি ১৯৭২ তারিখে মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে এ গানটির প্রথম দশ লাইন সদ্যগঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত হিসেবে নির্বাচিত হয়।

জাতীয় সংগীতের আদি ও অকৃত্রিম ভার্সনটিকে পুরোপুরি অনুসরণ করার চেষ্টা করা হয়েছে এখানে। খেয়াল রাখা হয়েছে, কোনো ধরনের বিকৃতি বা পরিবর্তন যেন না আসে কোথাও। জাতীয় সংগীত আমাদের কাছে অন্যরকম এক আবেগের আর ভালোবাসার নাম। সেই অনুভূতি যাতে আঘাতপ্রাপ্ত না হয়, সে বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত করা হয়েছে অর্কেস্ট্রা ভার্সনে। ভিজ্যুয়াল প্রেজেন্টেশন পাহাড় থেকে সাগর, জঙ্গল থেকে গ্রামের মেঠোপথ মূলত পুরো বাংলাদেশের রূপ ও ষড়ঋতুকে তুলে আনার চেষ্টা করা হয়েছে । 'আমার সোনার বাংলা' আমাদের অস্তিত্বের পরিচয়, আমাদের শেকড়ের উপস্থিতি, আমাদের স্বাধীনতার বহিঃপ্রকাশ।'এবার থেকে বিশ্বমঞ্চে আমাদের জাতীয় সংগীতের অর্কেস্ট্রা ভার্সন, বাজবে সগৌরবে। ■

প্রতিবেদন : শাহানা আফরোজ

মুক্তিযুদ্ধের কিশোর উপন্যাস

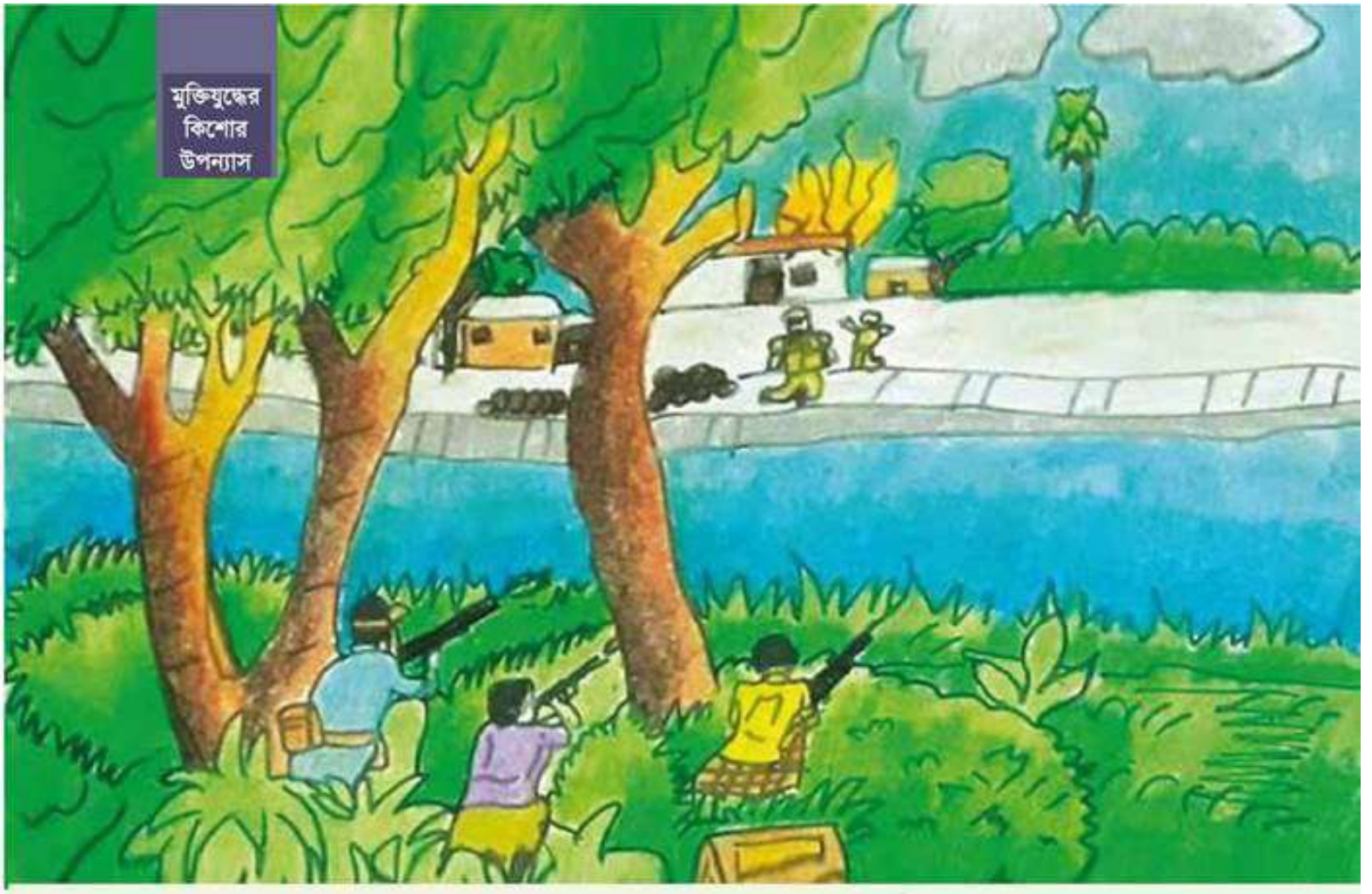

রতনপুরের বিচ্ছুবাহিনী

মুস্তাফা মাসুদ

[পূর্ব প্রকাশিতের পর: অষ্টম পর্ব]

দৌড়– মহাদৌড়

আমরা তখন বিল জলেশ্বরের পশ্চিম-দক্ষিণ প্রান্তঘেঁষা সুঁড়ো গ্রামে অবস্থান করছি। গ্রামটিতে এককভাবে হিন্দু নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের বসবাস। দিয়াড়ার মতো এ গ্রামেরও তিনদিকে জল, একদিকে স্থল। সেই স্থলভাগটি দক্ষিণ দিকে শুকদেবপুর গ্রামের দিকে প্রসারিত– এই শুকদেবপুরও এককভাবে নমঃশূদ্র সম্প্রদায়-অধ্যুষিত। এর পরেই আছে ভায়না এবং তারপর তারাগঞ্জ ও যশোর-নড়াইল মহাসড়ক।

সুঁড়ো-শুকদেবপুর– এই দুই গ্রামের যুবক-যুবতী এবং তরুণ-তরুণী ছেলেমেয়েরা সবাই বর্ডার পার হয়ে ভারতে চলে গেছে। বুড়ো-বুড়িরা শুধু বাড়িতে রয়েছে। কোনো কোনো বাড়িতে দুএকজন মা-বাবাহারা শিশুরা রয়েছে দাদা-দাদি বা নানা-নানির সাথে। কয়েকটি বাড়িতে রয়েছে বিধবা বৃদ্ধা কজন। তাদের আপনজন কেউ নেই বলে ঘরেই রয়ে গেছে। কিছু কিছু বাড়ি একেবারে ফাঁকা– কেউ নেই সেখানে। এই বাড়িগুলোতেই আমরা থাকছি। মাঝে মাঝে আশপাশে টুকটাক অপারেশনে অংশ নিচ্ছি। পাকিস্তানি সৈন্য আর রাজাকারদের এ দুই গ্রামের দিকে কোনো নজর নেই। কারণ, তারা জানে– সুঁড়ো বা শুকদেবপুর গ্রামের 'মালাউনরা' সব জয় বাংলায়, মানে ভারতে চলে গেছে। দুই একজন 'বুড্ডা আদমি' যারা আছে, ওদের মারলে খামোখা গুলি খরচ হবে; লাভের লাভ কিছু হবে না। গরু ছাগল-ধানচালও নেই; আগেভাগেই রাজাকারেরা ও আশপাশের প্রভাবশালীরা লুটে নিয়েছে। এখন যারা বাড়িতে আছে, তাদের না-খেয়ে মরার জোগাড়। সামান্য চালডাল তারা মাটির নিচে জালায় করে

লুকিয়ে রেখেছিল, তা শেষ হয়ে গেছে। আর দুদিন পরে ভিক্ষে করা ছাড়া ওদের কোনো উপায় থাকবে না। এমন অবস্থায় মুক্তিযোদ্ধারাই ওদের একমাত্র সহায়। দূরের গ্রাম থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য রসদ আসছে নৌকায় করে, বিলপথে। বিভিন্ন গ্রামে অনেক আগেই গোপনে গঠিত হয়েছে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী। তারাই অতি গোপনে এসব খাদ্যসামগ্রী পাঠাবার ব্যবস্থা করছে। তা থেকেই কিছু অংশ এই অসহায় মানুষগুলোকে দিচ্ছে সুঁড়ো-শুকদেবপুরের মুক্তিযোদ্ধারা। অন্যান্য গ্রামে যেখানে গ্রামবাসীরাই মুকিযোদ্ধাদের খাওয়া ও থাকার দায়িত্ব নেয়, এখানে হয়েছে তার কিছুটা ব্যতিক্রম– এখানে আমরা, মানে মুক্তিযোদ্ধারা শুধু থাকছি ওদের বাড়িতে, কিন্তু ওদের খাওয়ার ব্যবস্থা করছি আমরা। তা না হলে যুদ্ধের ভয়ঙ্কর দিনগুলোতে ওই অসহায় মানুষগুলোর যে কী সাংঘাতিক করুণ দশা হতো তা ভাবলে আজও আমার গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

যাহোক, মিলিটারি আর রাজাকারেরা ওদিকে যাচ্ছে না; আর এতেই মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য মহাসুবিধা হয়েছে। আমাদের রতনপুরের বিচ্ছুবাহিনীর অবস্থান সুঁড়ো গ্রামে এবং দাইতলা-চানপাড়ার ওদিকের ত্রিশজন মুক্তিযোদ্ধার আরেকটি দল শুকদেবপুর গ্রামে অবস্থান নিয়েছে। ওরা বাউলে-চানপাড়া-ফতেপুর-দাইতলার ওদিকে অপারেশন চালাচ্ছে। মাঝে মাঝে ইছালি-কামারগন্যের দিকেও যাচ্ছে– এ গ্রামগুলোই ওদের অপারেশন-এলাকা। মাঝে মাঝে যশোর-নড়াইল মহাসড়কে চলাচলকারী আর্মি-গাড়িতেও সফল হামলা চালাচ্ছে। ওদের শেল্টার বেশ খানিকটা দূরের প্রত্যন্ত শুকদেবপুর গ্রামে হওয়ায় আর্মি বা রাজাকারেরা বুঝতেই পারছে না বিচ্ছু গেরিলারা কোনদিক দিয়ে এসে হামলা করছে, আবার মুহূর্তে হাওয়া হয়ে যাচ্ছে।

আমাদের ব্যাপারটাও এরকম। আমরা কয়েকদিন আগে বলদেঘাটার ব্রিজ উড়িয়ে দিয়ে এলাম রাত সাড়ে দশটায়। দোরাস্তা দিয়ে আর্মিরা এই ব্রিজ পার হয়ে সরাসরি বাঘারপাড়ার দিকে যেত সহজে। এখন সে-রাস্তা বন্ধ; তারা অনেকটা পথ অর্থাৎ চাঁড়াভিটা ঘুরে চলাচল করছে। আমাদের অপারেশনটা ছোটো হলেও আর্মিদের বেশ ভোগাচ্ছে, এটাই-বা কম কী! তারপর লক্ষ্মীপুরের রাস্তায় রাজাকারের দুজন ঘাতককে সেদিন নিকেশ করে এলো আমাদের দুজন ছদ্মবেশী বিচ্ছু। শান্তি কমিটির এক নেতা অনেক দিন পরে লুকিয়ে বাড়ি এসেছে। বলদেঘাটা ব্রিজ অপারেশন করে ফিরে আসার পথে আমরা সেই নেতার বাড়ি আসার খবর পাই– গ্রামের এক তরকারি-দোকানদার পথেই আমাদের তা জানায়। আমরা রাস্তার পাশে আমবনে অবস্থান নিয়ে চারজন বিচ্ছুকে পাঠাই নেতার বাড়ি। ওরা আচমকা গ্রেনেড চার্জ করে বেইমানটাকে খতম করে, তারপর দ্রুত চলে আসে আমাদের অবস্থানে। আমরা গ্রামের উত্তর পাশের মাঠের কিনারা ধরে চলে যাই আমাদের আস্তানায়। কেউ কিছু বুঝতেই পারল না– আমরা কারা, কোনদিক দিয়ে এসেছি বা গিয়েছি।

তখন আগস্ট মাস। বিল জলেশ্বরে তখনো বেশ পানি। কিন্তু সুঁড়ো-শুকদেবপুরের দক্ষিণ-দক্ষিণপুব দিকটা ডাঙ্গা। এক বিকেলে হঠাৎ গুজব রটে গেল যে, শহর থেকে হাজার হাজার পাঞ্জাবি আর্মি গুলি করে মানুষ মারতে মারতে তারাগঞ্জ-দোরাস্তা-ছাতিয়ানতলার দিকে আসছে। সেখান থেকে তারা ভায়না-বুধোপুর- লক্ষ্মীপুর-হাবুল্যা পর্যন্ত আসবে। 'তেনাদের ইচ্ছে হলি এহান থেইকে শহরে ফিরে যাবে; নাহলি একটু দূরের বাঘারপাড়া-পাইকপাড়া-রামকান্তপুর-শালবরাট পর্যন্তও চলে যাতি পারে।' বুধোপুর গ্রামের কলিম দফাদারের এক আত্মীয় ধনাই মণ্ডল শহরে রাজাকারের হোমরাচোমরা, সে-ই রটিয়েছে এই গুজব। কিন্তু গ্রামের সাধারণ মানুষেরা তো আর বুঝছে না যে এটা স্রেফ গুজব– বাঙালিদের ভয় দেখাবার একটা নতুন কৌশল, তাই সবাই সেই রটনাকে সত্য বলেই ধরে নিয়েছে এবং একের মুখ থেকে শত মুখে সেই গুজব ছড়িয়ে পড়ছে বিদ্যুৎবেগে। আর তাতেই ঘটেছে মহাকাণ্ড– সেই চানপাড়া-বাউলে-ফতেপুর থেকে প্রাণ ভয়ে হাজার হাজার মানুষ ঘটিবাটি-সহায়সম্পদ ফেলে পুবদিকে দৌড়াতে শুরু করেছে– কখনো রাস্তার কুলঘেঁষে, কখনো পানিভরা খেত পাড়ি দিয়ে; কখনো মানুষের বসতবাড়ি ডিঙিয়ে। তাদের দেখাদেখি অন্যরাও কিছু না-জেনেই তাদের সাথে দৌড়ে শামিল হচ্ছে।

এমনও শোনা গেল যে– ভায়না গ্রামের ফোকলা দাঁতের এক খুনখুনে বুড়ি চেঁচিয়ে বলছে: ওরে তোরা পলা শিগগির। পাঞ্জাবিরা নাইফেল দিয়ে ছিয়াতি ছিয়াতি আসতেছে (পাঞ্জাবিরা রাইফেল দিয়ে কাটতে কাটতে আসছে), আমার নাতি মতিয়ার দেইখে আয়ছে নিজির চক্ষে।– বলেই বুড়ি নাকি সবাইকে পিছে ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে জোরপায়ে! কেউ তার সাথে দৌড়ে পারছে না!

এই ঘটনার কথা সুঁড়ো- শুকদেবপুরের মুক্তিযোদ্ধাদের কানেও যায়। প্রথমে অনেকেই বিশ্বাস করে ব্যাপারটি। প্রথমে আমিও কিছুটা দ্বিধায় পড়ে যাই, আমার অন্য সাথিরাও। এরিমধ্যে লোকজন আমাদের এদিকেও ঢুকতে শুরু করেছে। আমরা ভাবি– মহাঝামেলা হয়ে গেল তো! আমরা মোটামুটি নিরাপদে অবস্থান করছি এখানে। এখন এত মানুষ এদিকে ঢুকে পড়লে তো আমাদের অবস্থানের বিষয়টা জানাজানি হয়ে যাবে! এ কারণে এই শেল্টার থেকে অন্যত্র চলে যাওয়া ছাড়া তো অন্য পথ দেখি না। আমি এমনটা ভাবছি, এমন সময় কে যেন চিৎকার করতে করতে এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে আমাদের থেকে একটু দূরে, রাস্তার ওপরে। গলার স্বর শুনেই বোঝা যায় কোনো বৃদ্ধা মহিলা। আরো মানুষ দৌড়াচ্ছে এদিক-ওদিক। কিন্তু আমার আগ্রহ হলো এই বৃদ্ধাকে দেখার। এই শেল্টার ছাড়ার আগে অন্তত এর সাথে একটু কথা বলে যাই, দেখি কোনো তথ্য পাই কিনা। কয়েকজন বিচ্ছুকে আমার নিরাপত্তার বিষয়ে দৃষ্টি রাখার নির্দেশ দিয়ে আমি এগিয়ে যাই বুড়ির দিকে। আমার পরনে সাধারণ পোশাক– লুঙ্গি আর হাফ শার্ট। আমি যখন রাস্তায় বুড়ির কাছে পৌঁছি, ততক্ষণে সে আবার উঠে দাঁড়িয়েছে, এক্ষুনি দৌড় লাগাবে বলে। মুখে একটানা বিলাপ: ওরে বাজান রে, পাঞ্জাবিরা সব নাইফেল দিয়ে ছিয়াতি ছিয়াতি আসতেছে! যাই– পালাই!

'নাইফেল দিয়ে ছিয়াতি ছিয়াতি আসতেছে'– কথাটা শুনেই আমার খটকা লাগে। আমি এক ঝটকায় বুড়িমার হাত ধরে বলি: কী বলেন এসব! নাইফেল দিয়ে তো গুলি কত্তি হয়, ছিয়ায় ক্যামন করে? ছিয়াতি গেলি তো গাছিদা বা ছোরা লাগে!

আমার কথা শুনে বুড়ি থমকে যায়। হাতে ধরা কাপড়ের পোঁটলাটা মাটিতে রেখে আমতা আমতা করে– তা বাবা, আমি অত কী আর জানি! ওইযে ওরা সব কলো, তাই তো আমি কচ্ছি আর পালায়ে যাচ্ছি।– বলেই বুড়ি তার পোঁটলার ওপর বসে পড়ে এবং কোমর থেকে পানের ডিব্বাটা বের করে একটা পান মুখে দেয়। তখনই দেখলাম বুড়ির একটা দাঁতও নেই, খালি শাদা ভুঁষড়ো; তা এদিক-ওদিক নাড়িয়ে-নাড়িয়ে চমৎকারভাবে পান খেতে থাকে বুড়ি। আমি একটু হেসে বলি– এইযে বসে পান খাচ্ছেন, এখন যদি পাঞ্জাবিরা ছিয়াতি আসে?

বুড়ি তখন হাসতে হাসতে বলে: আমার মনে হয় তোমার কথাই ঠিক, বাবাজি– নাইফেল দিয়ে ছিয়ায় ক্যামনে? মনে হয় সব ঝুট কথা, ফালতু কথা। খালি খালি দৌড়ায়ে এতদূর আলাম....

বুড়ির কথা শেষ হওয়ার আগেই আমি বলি– মনে হয় আপনার কথাই ঠিক, বুড়িমা– সব গুজব– স্রেফ গুজব। তো, আপনি কি এখানে আরো একটু বসবেন? আমি একটু খোঁজখবর নিয়ে আসি। – বলেই আমি সামনে এগিয়ে যাই। আমার সাথিরাও

ছদ্মবেশে আমাকে অনুসরণ করে। খানিক বাদে শুকদেবপুর এসে দেখি, ওই গ্রামে বহু মানুষের ভিড়। তারা নানা কথাবার্তায় চারদিক গুলজার করে তুলেছে। তবে সবার মনেই সন্দেহ– এটা গুজব ছাড়া আর কিছু না, তা না হলি এই দুই তিন ঘণ্টা হয়ে গেল, পাঞ্জাবিরা আসল না ক্যান্? কেউ কেউ বাড়ির দিকে ফিরতে শুরু করে। অন্যরাও বসে জিরিয়ে নিচ্ছে, কিছু পরে তারাও ফিরে যাবে এমনই ভাব সবার মধ্যে। সবার মুখে একই কথা: এট্টা মিথ্যে গুজব শুনে খালি খালি এত দূর পথ আলাম!

বিষয়টা আমার কাছে খোলাসা হয়ে গেল– এটা স্রেফ একটা গুজব। তবে এত বড়ো গুজব রটানোর কারণ কী, সে বিষয়টা নিয়ে ভাবতে থাকলাম– তবে কি সবাইকে ভয় পাইয়ে দিয়ে হানাদার বা রাজাকারেরা অন্য কোনো কিছু করতে চায়? আমি এমনটা ভাবছি, এমন সময় সুন্দর ছিপছিপে গড়নের এক তরুণ আমার পাশে এসে দাঁড়ায়। আমি ওর দিকে তাকাতেই ও হেসে বলে– বাবু ভাই, আমি সুমন। এ গ্রামে যে মুক্তিযোদ্ধারা গোপনে অবস্থান নিয়েছে, আমি তাদের একজন। আমাদের কমান্ডার রওশন ভাই আমাকে পাঠিয়েছেন আপনার কাছে।

– ঠিক আছে, বলো কী জন্য এসেছ?

– জরুরি খবর আছে, ওই ঝোপের দিকটায় একটু আসেন।

আমি সুমনের সাথে পাশের ঝোপের আড়ালে যাই। আমার সাথিরা সবই চোখে চোখে রাখছে। আমি বললাম– বলো, কী জরুরি খবর।

সুমন ফিসফিস করে বলে– আজকের দৌড়টা কিন্তু এমনি এমনি না।

– মানে? সব খুলে বলো তো?

– আর্মি আর রাজাকারেরাই এমন কথা রটিয়েছে। ওদের উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষকে ভীত-সন্ত্রস্ত রেখে লুটপাট করা। ভয়ে মানুষেরা বাড়িঘর ছেড়ে পালালে ওরা ইচ্ছেমতো লুট করতে পারবে–

– আজও কী তাই হয়েছে?

– হয়েছে। দাইতলা, ফতেপুর, চানপাড়া এসব গ্রামের বহু বাড়ি লুট হয়েছে আজ। আর্মিরা বড়ো বড়ো ট্রাক ভরে মালামাল নিয়ে গেছে, গরু-ছাগলও নিয়ে গেছে অনেক। কেউ বাধা দেওয়ার নেই, গোলমাল হলো না; একটা গুলিও খরচ করতে হলো না– খুব সুন্দর না কৌশলটা?

সুমনের কণ্ঠে ঘৃণা আর বিদ্রুপের সুর। আমি বললাম– এই 'দৌড়' রোগের চিকিৎসা তো জলদি করা দরকার, তাই না? তা বলো– রওশন ভাই কী বলেছেন।

– তিনি বিশ্বস্ত সূত্রে খবর পেয়েছেন– আগামী বুধবার মিলিটারি আর রাজাকারেরা চাঁড়াভিটা বাজার লুট করতে আসবে। ওইদিন চাঁড়াভিটায় গরু-ছাগলের হাট বসে। ওটাই পাকি আর্মি আর রাজাকারদের লক্ষ্য। বিনা পয়সায় তাজা তাজা গরু-ছাগল ট্রাকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়া আর পেট ভরে খাওয়া– এমন অপারেশন ওদের কাছে যেন দারুণ এক অ্যাডভেঞ্চারের মতো!– আবারো ব্যঙ্গ ঝরে সুমনের কণ্ঠে। তারপর কণ্ঠ স্বাভাবিক করে আবার বলে– চাঁড়াভিটা আপনাদের এরিয়ায় বলে এ ব্যাপারে আপনাদেরই ব্যবস্থা নিতে হবে। আপনি চাইলে আমাদের দলও রতনপুরের বিচ্ছুবাহিনীর সহযোগী হিসেবে থাকবে। সময় হাতে আছে মাত্র দুদিন। দ্রুত ব্যবস্থা নিতে না পারলে মানুষের মহা ক্ষতি হয়ে যাবে। খবর আছে, চাঁড়াভিটা রাজাকার ক্যাম্পের রাজাকাররাও লুটের কাজে সহযোগিতা করবে।

আমি সুমনকে বললাম– আমরা যথাসময়ে শয়তানদের উপযুক্ত জবাব দেবো। তুমি এখন যাও। আমার মনে হয়– রতনপুরের বিচ্ছুবাহিনীর যোদ্ধারা একাই ওদের ঠেকিয়ে দেবে। আমি আমাদের কমান্ডার জমির ভাইয়ের সাথে কথা বলে প্ল্যান চূড়ান্ত করব। কোনো চিন্তা করো না, রওশন ভাইকে সব কথা খুলে বলবে। সুমন চলে যায়। ■ *(চলবে)*

শিশু সাহিত্যিক

টুঙ্গিপাড়ার খোকা

দেওয়ান বাদল

প্রিয় শিশু-কিশোর ভাই-বোনেরা, তোমরা তো জানো টুঙ্গিপাড়ার খোকার কথা। এই খোকা কী করে হয়ে উঠলেন আমাদের প্রাণপ্রিয় মহান নেতা? কীভাবে হলেন স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের স্থপতি? এদেশের মানুষের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হয়ে ওঠা সেসব কথা তোমাদের জানানোর জন্য আমার এই লেখা। একজন মহামানবকে জানলে তোমরা সেই শিক্ষায় নিজেদের গড়ে তুলতে পারবে।

ছোট্টমণিরা, মধুমতি নদীর তীরে ছায়াঢাকা, পাখির কলকাকলিমুখর গ্রাম টুঙ্গিপাড়া। এখানে খোকা জন্মগ্রহণ করেন ১৯২০ সালের ১৭ই মার্চ। টুঙ্গিপাড়া তখন ছিল ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমায়। খোকার জন্মভূমি বলে গ্রামটি অতি পরিচিত। এই গ্রামে বড়ো হয়ে ওঠেন খোকা। বাবা শেখ লুৎফর রহমান। তিনি দেওয়ানি আদালতের সেরেস্তাদার ছিলেন। মা শেখ সায়েরা খাতুন। জন্মের পর বাড়িতে তাঁর আদরের নাম ছিল খোকা। আকিকা দিয়ে নাম রাখা হয় শেখ মুজিবুর রহমান। খোকারা ছয় ভাইবোন। তাদের মধ্যে খোকা ছিলেন তৃতীয়। আর ভাইদের মধ্যে প্রথম। বোনের মধ্যে খোকার বড়ো দুই বোন শেখ ফাতেমা বেগম ও শেখ আছিয়া বেগম এবং ছোট্ট দুই বোন শেখ আমেনা বেগম ও শেখ খোদেজা বেগম। একমাত্র ভাই শেখ আবু নাসের ছিল সবার ছোট্ট।

সোনামণিরা, বাবা-মা-ভাইবোনের আদরে টুঙ্গিপাড়ার সবুজ প্রকৃতির মাঝে বড়ো হয়ে স্কুলে যাওয়ার বয়স হয় খোকার। বাবা তাকে এম ই স্কুলে ভর্তি করেন ১৯২৭ সালে। তখন খোকার বয়স সাত বছর। এখানে তিনি তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেন। এরপর ১৯২৯ সালে বাবা তাকে নিজের চাকরির জায়গায় গোপালগঞ্জে নিয়ে আসে। সেখানে খোকাকে গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি করেন।

ছোটো বয়স থেকেই খোকা মানুষকে ভালোবাসতে শিখেছিলেন। বর্ষাকালে স্কুলে যেতে বৃষ্টিতে ভিজলে অসুখ করতে পারে সেজন্য বাবা খোকাকে একটি ছাতা কিনে দিয়েছিলেন। খোকার এক গরিব বন্ধুকে বৃষ্টিতে ভিজে স্কুলে আসতে হতো দেখে খোকা তাঁর নিজের ছাতাটি তাকে দিয়ে দেন। এমন আরেকটি ঘটনা ছিল শীতকালের। হাড় কাঁপানো শীত পড়েছিল। খোকাকে সুন্দর গায়ের চাদর কিনে দিয়েছিলেন বাবা। খোকা সেই চাদর গায়ে একদিন বন্ধুদের সঙ্গে স্কুল থেকে ফিরছিলেন। তখন তিনি দেখলেন একজন বুড়ো মানুষ পথের ধারে বসে ভিক্ষা করছেন। তার গায়ে কোনো গরম কাপড় নেই। প্রচণ্ড শীতে তিনি ঠকঠক করে কাঁপছেন। খোকা নিজের গায়ের চাদর বুড়োর গায়ে জড়িয়ে দিলেন। ঘটনা দুটি পড়ে এখন তোমরা বুঝতে পার যে, তোমাদের মতো বয়সেই মানুষের জন্য খোকার কত বড়ো ভালোবাসার মন ছিল।

ছোট্টমণিরা, খোকার প্রাইমারি স্কুলের পড়ালেখা শেষ হয় ১৯৩২ সালে। ১৯৩৪ সালে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ার সময় তাঁর বেরিবেরি রোগ হয়। এ কারণে পড়াশোনায় দুই বছর পিছিয়ে পড়েন। ১৯৩৬ সালে তাঁর বাবা মাদারীপুরে বদলি হন। পিছিয়ে পড়ায় খোকা একই স্কুলে পূর্বের শ্রেণিতে পড়তে চান না। তাই শেখ লুৎফর রহমান খোকাকে নিজের কাছে নিয়ে যান। খোকার মা স্বামীর সঙ্গে শহরে থাকতেন না। গ্রামে টুঙ্গিপাড়ায় থাকতেন। বাবা মাদারীপুরে খোকাকে ইসলামিয়া হাই স্কুলে ভর্তি করেন সপ্তম শ্রেণিতে। এ সময় খোকার চোখের অসুখ হয়। কঠিন অসুখ। পড়াশোনা করতে পারতেন না। শেখ লুৎফর রহমান ছেলের চোখের চিকিৎসার জন্য কলকাতায় নিয়ে যান। কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসায় তাঁর চোখের অসুখ ভালো হয়। সময় লাগে এক বছর। পড়াশোনায় আবার তিনি এক বছর পিছিয়ে পড়েন। ডাক্তারের পরামর্শে তিনি চশমা পরা শুরুর করেন। ১৯৩৭ সালে তাঁর বাবা আবার গোপালগঞ্জে বদলি হন। এখানে তাঁকে গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে ভর্তি করা হয়। তিন বছর পড়াশোনা বন্ধ থাকায় বয়স বেড়ে গেলেও আবার তাঁকে সপ্তম শ্রেণিতেই ভর্তি হতে হয়।

কিশোর বয়সেই মানুষের জীবন সম্পর্কে খোকা অনেক কিছু বুঝতে শিখেছিলেন। তিনি দুর্ভিক্ষের সময় বাবার গোলার ধান গরিবদের মাঝে বিতরণ করেন। স্কুলের গরিব ছাত্রদের পড়ালেখায় সাহায্য করতে হামিদ মাস্টার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'মুষ্টিভিক্ষা সমিতি'। এই সমিতির জন্য খোকা বন্ধুদের নিয়ে চাল মুষ্টিভিক্ষা করতেন। এভাবে এই সমিতি কিশোর খোকার মানুষকে ভালোবাসার জায়গা বাড়িয়ে দেয়। জমির মালিকরা ভাগ চাষিদের ঠকাত। ঠিকমতো ভাগ দিত না। খোকা সেই বয়সেই বুঝেছিলেন গরিব মানুষকে এভাবে শোষণ করা অন্যায়। ব্রিটিশ শাসন থেকে দেশকে স্বাধীন করতে ১৯৩১ সালে গুরু সদয় দত্ত ব্রতচারী আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। কিশোর বয়সেই এই আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন খোকা। ইংরেজদের দেশ থেকে তাড়াতে হবে বিষয়টি ওই বয়সেই বুঝেছিলেন তিনি।

১৯৩৮ সালে মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে. ফজলুল হক গোপালগঞ্জ সফরে আসবেন। তাঁকে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। তাঁর সফর সঙ্গী হয়ে আসবেন শ্রমমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। কিন্তু সংবর্ধনা অনুষ্ঠান করা যাবে না বলে অনেকে বাধা দিচ্ছিল। শহরের নেতারা অনুষ্ঠানটি করার পক্ষে ছিল না। বিরোধী দলও বিরোধিতা করছিল। শেখ মুজিব আয়োজনের একজন কর্মী ছিলেন। তাঁর সাহসী ভূমিকায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠান হলো। ছাত্রনেতা হিসেবে সবাই তাঁকে ভালোবাসতে শুরু করল। সংবর্ধনা শেষে শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক গেলেন পাবলিক হল দেখতে। আর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গেলেন মিশন স্কুল পরিদর্শনে। স্কুল পরিদর্শন শেষে মন্ত্রী যখন বের হয়ে যাচ্ছিলেন তখন এই স্কুলের অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র শেখ মুজিব কয়েকজন ছাত্রকে নিয়ে মন্ত্রীর সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমাদের স্কুলের ছাত্রাবাসের ছাদ ফেটে গেছে। বৃষ্টি হলেই সেখান দিয়ে পানি পড়ে।' মন্ত্রীকে একথা বলার জন্য স্কুলের প্রধান শিক্ষক তাঁকে ধমক দিয়েছিলেন। কিন্তু খোকা ছাত্রদের অধিকারের জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। সেজন্য মন্ত্রী খুশি হয়ে তাঁকে কাছে ডেকে আদর করেছিলেন এবং কলকাতায় গেলে তাঁকে দেখা করতে বলেছিলেন। মন্ত্রী ব্যবস্থা গ্রহণ

করেছিলেন। ছাদ মেরামত হয়েছিল। সবাই খুশি হয়েছিল খোকার এমন অসাধারণ কাজে।

ছোটোমণিরা, এভাবেই স্কুল জীবনেই তিনি রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। ১৯৩৯ সালে মিশন স্কুলে নবম শ্রেণিতে পড়ার সময় তিনি গোপালগঞ্জ মুসলিম ছাত্রলীগের সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪০ সালে এই স্কুলে দশম শ্রেণিতে পড়ার সময় নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দেন। এসময় এক বছরের জন্য কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। ১৯৪২ সালে এই স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে আই.এ ভর্তি হন। এখানে তিনি বেকার হোস্টেলের দোতলার ২৪ নম্বর কক্ষে থাকতেন। ১৯৪৩ সালে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন। ছাত্রনেতা হিসেবে তিনি খুব পরিচিত ছিলেন। ছাত্র জীবনেই তিনি নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও মজলুম জননেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানি প্রমুখের সাহচার্যে আসেন। ১৯৪৬ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইসলামিয়া কলেজের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালে তিনি এই কলেজ থেকে বি.এ পাশ করেন।

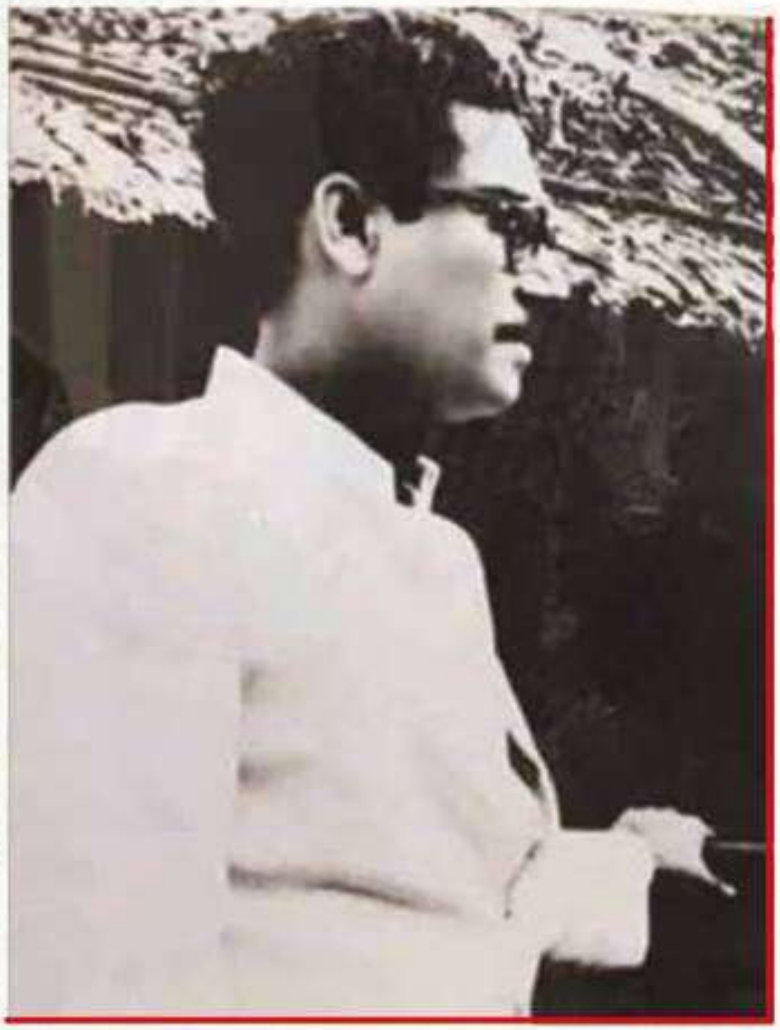

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ থেকে ইংরেজ শাসকরা বিদায় হয়। এ সময় শেখ মুজিব কলকাতা থেকে পূর্ববঙ্গে চলে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে ভর্তি হন। তখন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল ছিলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এবং লিয়াকত আলী খান ছিলেন প্রধানমন্ত্রী। নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানের একটি অংশ পূর্ববঙ্গ, অপর অংশ পশ্চিম পাকিস্তান। দুই অংশের মাঝে দূরুত্ব প্রায় ১২শ মাইল। পূর্ববঙ্গের জনসংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়ে বেশি। অথচ পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই পশ্চিম অংশের অনির্বাচিত শাসকরা পূর্ববঙ্গের প্রতি অগণতান্ত্রিক আচরণ শুরু করে।

প্রথম আঘাত আসে ভাষার ওপর ১৯৪৮ সালে। ২৫ শে ফেব্রুয়ারি লিয়াকত আলী খান ঘোষণা করেন, পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। প্রতিবাদে পূর্ববঙ্গের বাঙালিরা বিক্ষোভে ফেটে পরে। শেখ মুজিব এই আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ১১ই মার্চ ১৪৪ ধারা উপেক্ষা করে ছাত্র-জনতা মিছিল করে। এই মিছিলের নেতৃত্ব দেন শেখ মুজিব। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার অভিযোগে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। এরপর জেল থেকে মুক্তি পেয়ে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের

চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলনে যুক্ত হওয়ায় গ্রেফতার হন। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁর ছাত্রত্ব বাতিল করে।

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে। শেখ মুজিব ছিলেন জেলে। তিনি জেল থেকেই বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে বার্তা পাঠান। তাঁর পরামর্শেই সর্বদলীয় 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন করা হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মিছিল করার সিদ্ধান্ত হয়। ছাত্রদের আন্দোলন বানচাল করার জন্য ২০ তারিখ সন্ধ্যা থেকে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ১৪৪ ধারা জারী করা হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারি ছাত্ররা ১৪৪ ধারা অমান্য করে মিছিল বের করে। গুলি চালায় পুলিশ। শহিদ হন আবদুস সালাম, আবুল বরকত, রফিক উদ্দিন, আব্দুল জব্বার। ২২শে ফেব্রুয়ারি পুলিশি হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে শোকযাত্রা চলাকালে পুলিশের গুলিতে শহিদ হন শফিউর রহমান, ওহিউল্লাহ, আব্দুল আউয়াল। পরবর্তীতে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয় সরকার।

১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জ আসনে বিজয়ী হয়ে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় কৃষি, সমবায় ও পল্লী উন্নয়ন মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব পান। এই মন্ত্রিসভায় সবচেয়ে কম বয়সি সদস্য ছিলেন তিনি। এরপর ১৯৫৬ সালে তিনি কোয়ালিশন সরকারের শিল্প, বাণিজ্য, শ্রম, দুর্নীতি দমন ও ভিলেজ এইড মন্ত্রী হন। এ সময় তিনি আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন। একই সঙ্গে মন্ত্রী এবং দলের সাধারণ সম্পাদক থাকা যাবে না। তাই দলকে শক্তিশালী করতে ১৯৫৭ সালে তিনি মন্ত্রিত্ব থেকেই পদত্যাগ করেন। ব্যক্তিস্বার্থের চেয়ে মানুষের স্বার্থে অনেক বেশি নিবেদিত ছিলেন তিনি।

পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বুঝতে পারে পাকিস্তান সরকার সব উন্নয়নমূলক কাজ পশ্চিম পাকিস্তানে করেছে। পূর্ব পাকিস্তানের পাট বিক্রির টাকাও ব্যয় হয় পশ্চিম পাকিস্তানে। পাকিস্তান সরকারের বৈষম্যের কবল থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষা করতে হলে স্বায়ত্তশাসন দরকার। এই ভাবনা থেকে শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৬ সালে ২৩শে মার্চ ছয় দফা দাবি পেশ করেন।

১৯৬৮ সালে ৩রা জানুয়ারি পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে আলাদা করার চক্রান্তের অভিযোগে শেখ মুজিবকে এক নম্বর আসামি করে মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়। ১৯৬৯ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি ব্যাপক গণআন্দোলনের চাপের মুখে সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে শেখ মুজিবসহ সব আসামীকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ২৩শে ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে রমনা রেসকোর্স ময়দানে বাঙালির প্রাণপ্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে সংবর্ধনার আয়োজন করা হয়। এই সমাবেশে সেই সময়ের ডাকসুর সভাপতি তোফায়েল আহমেদ তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করেন।

বঙ্গবন্ধু পরবর্তীতে এমন আরো উপাধিতে ভূষিত হন। ১৯৭১ সালের ৩রা মার্চ স্বাধীন বাংলার ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ তাঁকে 'জাতির জনক' উপাধি দেয়। আমেরিকার নিউজ উইক ম্যাগাজিন তাঁকে 'পোয়েট অব পলিটিক্স' বা 'রাজনীতির কবি' উপাধি দেয় ১৯৭১ সালের ৫ই এপ্রিল। ২০০৪ সালে বিবিসি তাঁকে উপাধি দেয় 'হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি'।

১৯৬৯ সালের ৫ই ডিসেম্বর শহীদ সোহরাওয়ার্দীর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আওয়ামী লীগের আলোচনা সভায় বঙ্গবন্ধু পূর্ব বাংলার নামকরণ করেন 'বাংলাদেশ'।

১৯৭০ সালের নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর অসাধারণ রাজনৈতিক প্রজ্ঞায় আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। এই বিজয়ে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হবেন বঙ্গবন্ধু। তারপরও ইয়াহিয়া সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করতে গড়িমসি ও ছলচাতুরী শুরু করে। এজন্য বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ রেসকোর্স ময়দানে এক ঐতিহাসিক ভাষণে অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিয়ে বলেন, 'আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়'। ভাষণ শেষ করেন এই বলে, 'এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার

সংগ্রাম'। তাঁর এই ভাষণে স্পষ্ট হয়ে যায় বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ।

২৪শে মার্চ পর্যন্ত অসহযোগ আন্দোলন চলে। ২৫শে মার্চ গভীর রাতে ঘুমন্ত বাঙালির উপর পাকিস্তানি সৈন্যরা ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং নির্বিচারে হত্যাযজ্ঞ চালায়। ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে একটি বার্তা সারা দেশে পাঠিয়ে দেন। এরপর রাত ১টা ৩০ মিনিটে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধ। তিন দিন পর বন্দি বঙ্গবন্ধুকে সঙ্গোপনে আকাশ পথে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো হয়। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস সেখানে তিনি কারাগারে আটক ছিলেন।

১০ই এপ্রিল বঙ্গবন্ধুকে রাষ্ট্রপতি করে বাংলাদেশের প্রথম সরকার গঠিত হয়। বঙ্গবন্ধু পশ্চিম পাকিস্তানে বন্দি থাকায় সৈয়দ নজরুল ইসলাম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কর্ণেল এম.এ.জি ওসমানীকে প্রধান সেনাপতি করে ১১টি সেক্টরে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়। ভারতের সহযোগিতায় মুক্তিবাহিনী বিপুল সাহসে যুদ্ধ করে। বঙ্গবন্ধু তখনো পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি। রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসিতে হত্যার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল ইয়াহিয়া সরকার। তাই বঙ্গবন্ধু যে সেলে আটক ছিলেন সেই সেলের পাশে তার জন্য কবর খোঁড়া হয়েছিল। তবু তিনি একটু ভয় পাননি। মৃত্যুর ভয়ে তিনি কখনো বিচলিত হতেন না।

বঙ্গবন্ধুর নির্দেশে দীর্ঘ নয় মাস রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে ১৬শে ডিসেম্বর পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে বাঙালির বিজয় অর্জিত হয়। এ দিনটি আমরা বিজয় দিবস হিসেবে আমরা পালন করি।

আন্তর্জাতিক চাপের মুখে ১৯৭২ সালের ৮ই জানুয়ারি পাকিস্তান সরকার বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। মুক্তির পর বঙ্গবন্ধু ইংল্যান্ড ও ভারত হয়ে ১০ই জানুয়ারি তাঁর স্বপ্নের স্বাধীন বাংলাদেশে ফিরে আসেন। বিমানবন্দর থেকে রেসকোর্স পযর্ন্ত মানুষের ঢল নামে। তেজগাঁও বিমানবন্দর থেকে তিনি সরাসরি রেসকোর্স ময়দানে চলে যান এবং জনতার উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। একই দিনে তিনি রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১২ই জানুয়ারি সংসদীয় সরকার প্রবর্তন করে তিনি এই সরকারের প্রধানমন্ত্রী হন। সরকারের দায়িত্ব নিয়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশ গড়ে তোলার জন্য অনেক কাজ করতে শুরু করেন।

সোনামণিরা, বঙ্গবন্ধু শিশুদের উন্নয়নের জন্য আলাদাভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। শিশুরা যাতে বিনা বেতনে শিক্ষা লাভ করতে পারে তাই তিনি দেশের সব শিশুর শিক্ষার জন্য ৩৬ হাজারের বেশি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারি করেন। শিশুদের অধিকার রক্ষার জন্য তিনি ১৯৭৪ সালে শিশু আইন করেছিলেন। আর জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ প্রণয়ন করে ১৯৮৯ সালে। ভেবে দেখো জাতিসংঘেরও ১৫ বছর আগে তিনি শিশুদের জন্য আইনের প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবেছিলেন। ১৯৭২ সালে ২৬শে মার্চ রেডিও ও টেলিভিশনে দেওয়া ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, 'শ্মশান বাংলাকে আমরা সোনার বাংলা করে গড়ে তুলতে চাই। যে বাংলায় আগামী দিনের মায়েরা হাসবে, শিশুরা খেলবে। আমরা শোষণমুক্ত সমাজ গড়ে তুলবো'। এমনই ছিল বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন।

বন্ধুরা, তোমরা জেনে খুশি হবে যে, বঙ্গবন্ধু 'জুলিও কুড়ি' শান্তি পুরস্কার লাভ করেন। বিশ্ব শান্তি পরিষদের সবচেয়ে বড়ো সম্মান এই পুরস্কার। বিশ্ব শান্তি পরিষদ বঙ্গবন্ধুকে এই পুরস্কার ঘোষণা করে ১৯৭২ সালের ১০ই অক্টোবর। আর এই পুরস্কার তাঁকে প্রদান করা হয় ১৯৭৩ সালের ২৩শে মে ঢাকায় এশীয় শান্তি সম্মেলনে। সেদিন বঙ্গবন্ধুর হাতে এই পুরস্কার তুলে দিতে বিশ্ব শান্তি পরিষদের সেক্রেটারি জেনারেল রমেশচন্দ্র বলেছিলেন, আপনি শুধু বঙ্গবন্ধু নন, আপনি 'বিশ্ববন্ধু'। আবার এই বছরই আলজিয়ার্সে অনুষ্ঠিত জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনে কিউবার প্রেসিডেন্ট ফিদেল ক্যাস্ট্রো তাঁর ভাষণে শেখ মুজিব সম্পের্কে বলে ছিলেন 'I Have not seen the Himalayas. But I have seen Sheikh Mujib . In personality and incourage, this man is the Himalayas. I have thus had the experience of witnessing the Himalayas.' 'আমি হিমালয় দেখিনি। কিন্তু শেখ মুজিবকে দেখেছি। ব্যক্তিত্ব এবং সাহসে এই মানুষ হিমালয়ের সমান ।'

ছোটোমণিরা, ভেবে দেখো একজন নেতা তাঁকে বলেছেন 'বিশ্ববন্ধু' এবং আরেকজন তাকে 'হিমালয়' বলেছেন। আন্তর্জাতিক বিশ্বে তিনি এভাবে পরিচিত ছিলেন।

সোনামণিরা, তোমরা জেনে আনন্দ পাবে যে ১৯৭৪ সালের ২৫শে সেপ্টেম্বর বঙ্গবন্ধু জাতিসংঘে বাংলা ভাষায় ভাষণ দিয়েছিলেন। ২০১৯ সালে নিউইয়র্ক গভর্নর তাদের সিনেট মিটিংয়ে তাই ২৫শে সেপ্টেম্বরকে 'বাংলাদেশ ইমিগ্র্যান্ট ডে' হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। দিনটি প্রতি বছর আমেরিকায় উদযাপন করা হবে। এজন্য এটি আমাদের একটি গৌরবময় দিন। আর ইউনেস্কো বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণকে 'বিশ্ব প্রামাণ্য ঐতিহ্য' হিসেবে সংরক্ষণ করেছেন। এটিও বাঙালির গৌরবময় অর্জন।

বঙ্গবন্ধু এদেশের মানুষের জন্য নিজেকে উজার করে দিয়েছিলেন। তিনি স্বাধীনতার স্থপতি, জাতির পিতা। তারপরও উচ্চাভিলাষী বিশ্বাসঘাতক কতিপয় সেনা অফিসার তাঁকে রেহাই দেয়নি। সপরিবারে খুন করেছে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট। সেসময় বঙ্গবন্ধু ছিলেন রাষ্ট্রপতি।

এক নির্মম নিষ্ঠুরতায় তারা হত্যা করে বঙ্গবন্ধুর সহধর্মিনী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, তিন পুত্র শেখ কামাল, শেখ জামাল, শেখ রাসেল ও দুই পুত্রবধু সুলতানা কামাল, রোজি জামাল এবং একমাত্র ছোট্টভাই শেখ আবু নাসেরকে।

দুই কন্যা, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা সেই সময় বিদেশে ছিলেন বলেই বেঁচে আছেন। ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের বাড়ির বাইরেও ঘাতকরা আক্রমণ চালায়। মিন্টু রোডে মন্ত্রী আব্দুর রব সেরনিয়াবাত এবং ধানমন্ডিতে শেখ ফজলুল হক মনির বাড়িতে পরিবারের সদস্যসহ সবাইকে হত্যা করা হয়। বঙ্গবন্ধুর পরিবারের সব সদস্যকে বনানী কবরস্থানে দাফন করা হয়। শুধু বঙ্গবন্ধুর মরদেহ টুঙ্গিপাড়ায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁকে দাফন করা হয়। কাপড় ধোয়ার ৫৭০ সাবান দিয়ে তাঁকে গোসল করানো হয়। রিলিফের শাড়ির পাড় ছিঁড়ে ফেলে সেই কাপড় দিয়ে তাঁকে দাফন করা হয়েছিল।

কিশোর বয়সেই ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন এবং ১৯৪৭ থেকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের মধ্যে অন্যায় শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান শেখ মুজিব। পৃথিবীর

খুব অল্পসংখ্যক নেতার মধ্যে তিনি একজন, যিনি মানব মুক্তির লক্ষ্যে দীর্ঘ জীবন কারাগারে বন্দি থেকেছেন। বঙ্গবন্ধু মোট একুশবার গ্রেফতার হয়ে জীবনের ১৪ বছর কারাগারে কাটিয়েছেন।

ছোটোমণিরা, এ পর্যন্ত পড়ে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ যে তিনি কীভাবে খোকা থেকে আমাদের প্রাণ প্রিয় মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর হয়ে উঠলেন। তাঁর ডাকে বাংলার মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে দেশ স্বাধীন করেছে। তাই তিনি 'স্বাধীনতার স্থপতি'। তিনি জাতির সব রকম মুক্তির কথা চিন্তা করেছেন। জাতির ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য কাজ করেছেন। এভাবে তিনি জাতির অভিভাবক হয়ে ওঠেন। তাই তিনি এদেশের মানুষের 'জাতির পিতা'। ■

প্রাবন্ধিক

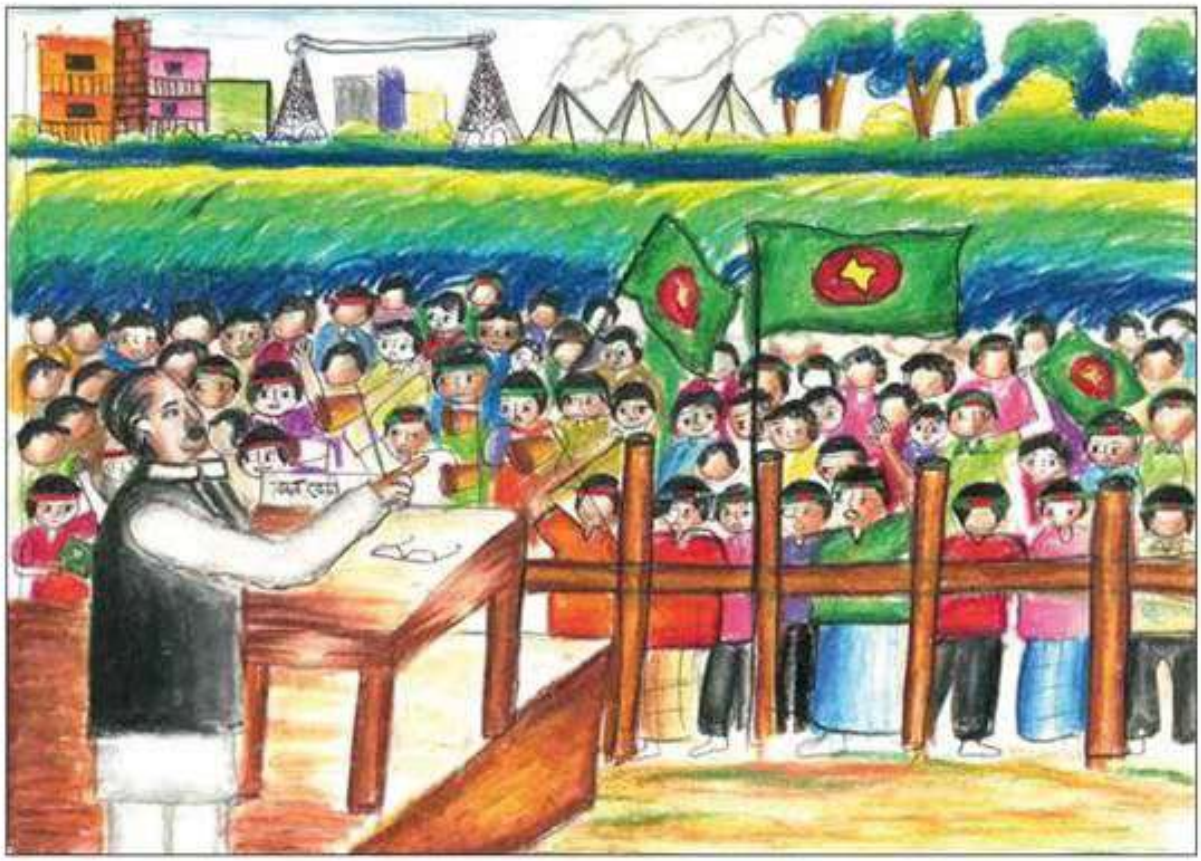

মারিশা মাহপারা, পঞ্চম শ্রেণি, দোহাকুলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, বাঘার পাড়া, যশোর

সততা, মানবতা ও উদারতায় শেখ মুজিব

রহিম আব্দুর রহিম

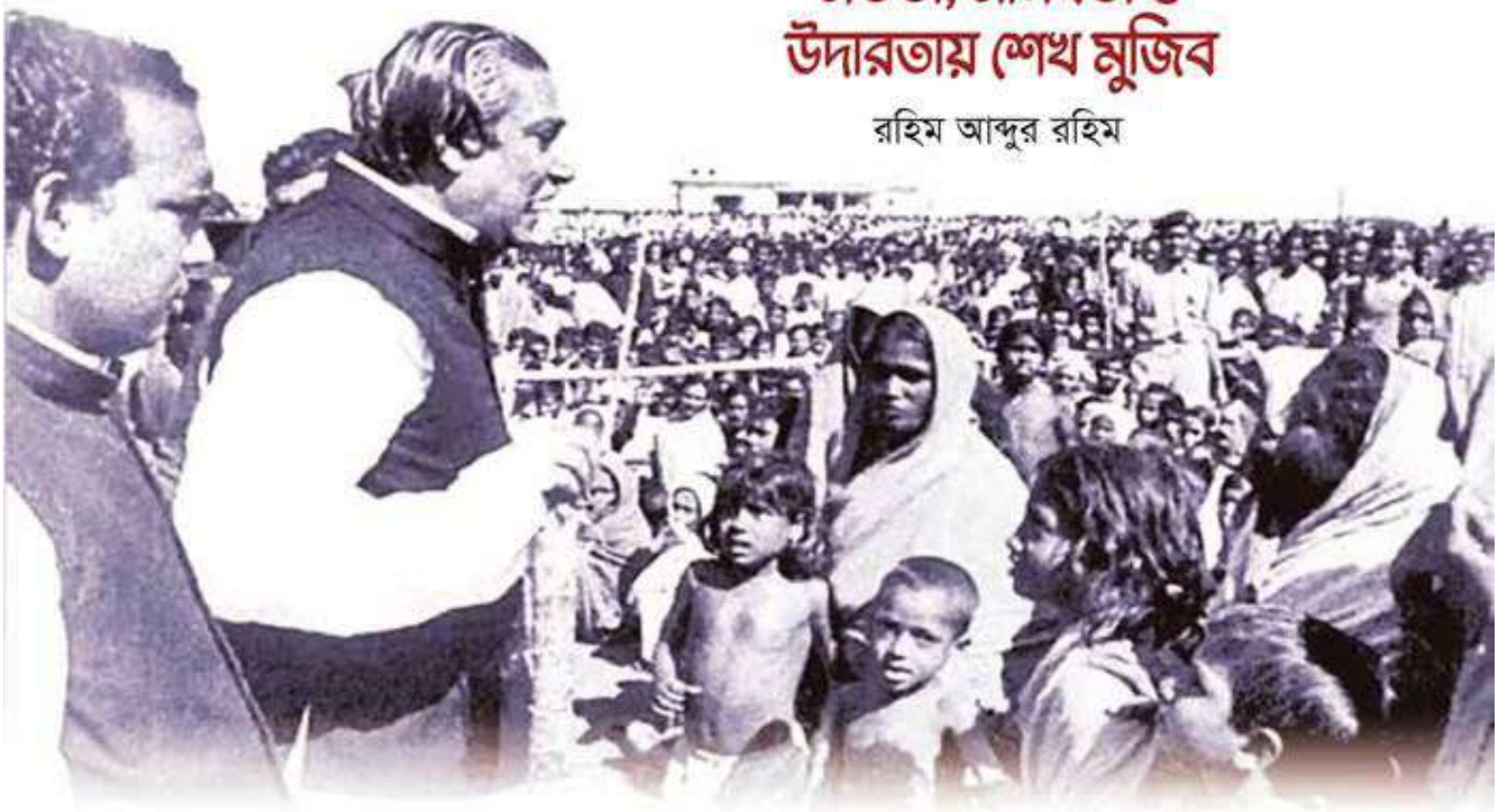

রাজনৈতিক নেতা ও আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব শেখ মুজিবুর রহমানের স্থান বিশ্ব সম্মোহনী সারির সর্বাগ্রে। যাঁর সততা অনুকরণীয়। মহাদেশের বরেণ্য নেতারা বঙ্গবন্ধুর সততার কাছে বিনয়ী হয়ে দাঁড়িয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর পুরো জীবনটাই এক আদর্শিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিশ্ব দরবারে স্থান পেয়েছে।

লেখক রাকিব উদ্দিন বুলবুলের লেখা প্রবন্ধ 'মুজিব আদর্শ'- এ উল্লেখ করেন, 'একদা ভাষাণী সাহেব শেখ মুজিবকে কোনো এক রাজনৈতিক কাজে নারায়ণগঞ্জ পাঠান। সাথে দিয়েছিলেন আটখানা পয়সা। কাজ শেষ করে বিকেলে এসে মাওলানা ভাষানীর হাতে বঙ্গবন্ধু আটখানা পয়সাই ফেরৎ দেন। এতে ভাষানী সাহেব খুবই অবাক হলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, 'ঘটনা কি মুজিব, তুমি নারায়ণগঞ্জ কীভাবে গেলে?' বঙ্গবন্ধু উত্তর দিলেন, 'সাইকেলে করে গিয়েছি, টাকাটা বেঁচে গিয়েছে।' বঙ্গবন্ধুর সততার এই দৃষ্টান্ত কোনো ব্যক্তি মানুষের নয়, গোটা বাঙালি জাতির অহংকার এবং গৌরবের চির ভাস্কর।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম পুলিশ সপ্তাহ ১৫ই জানুয়ারি ১৯৭৫ সালের ভাষণে তাঁর সততার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন এভাবে, 'মাঠে, কলকারখানায় সর্বত্র আমাদের উৎপাদন বাড়ানোর জন্য কাজ করতে হবে...। এবার আমি আপনাদের কাছে সাহায্য চাই। আপনারা একবার আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করুন, 'আমরা দুর্নীতির উর্দ্ধে থাকবো।' প্রতিজ্ঞা করুন, 'আমরা দেশের মানুষকে ভালোবাসবো। 'প্রতিজ্ঞা করুন, 'আমরা দেশের মাটিকে ভালোবাসবো। যারা দুর্নীতিবাজ, সুদখোর, রাতের অন্ধকারে যারা মানুষ হত্যা করে, থানা আক্রমন করে, অস্ত্র নিয়ে আপনাদের মোকাবেলা করে, বাংলাদেশের মাটি থেকে তাদের উৎখাত করুন'।' এই ভাষণই প্রমাণ করে বঙ্গবন্ধু সততার কত উচ্চাসনে আরোহন করেছেন।

বঙ্গবন্ধুর মানবিক গুণাবলির একটি পরিচ্ছন্ন অংশ ওঠে এসছে 'শেখ মুজিব আমার পিতা' (সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৬ই আগস্ট ১৯৯৬) প্রবন্ধের একাংশে। যেখানে শেখ হাসিনা লেখেছেন, *'গ্রামের সহজ-সরল মানুষের সঙ্গে অত্যন্ত সহজভাবে তিনি মিশতেন। ছোটোবেলা থেকেই অত্যন্ত হৃদয়বান ছিলেন। তখনকার দিনে ছেলেদের পড়াশোনার তেমন সুযোগ ছিল না। অনেকেই বিভিন্ন বাড়িতে জায়গীর থেকে পড়াশোনা করত। চার-পাঁচ মাইল পথ হেঁটে তাদের ফিরতে হতো। সকালে ভাত খেয়ে স্কুলে আসত। আর সারাদিন অভুক্ত অবস্থায় অনেক দূর হেঁটে তাদের ফিরতে হতো। যেহেতু আমাদের বাড়িটি ছিল ব্যাংক পাড়ায়, আব্বা (বঙ্গবন্ধু) তাদেরকে বাড়িতে নিয়ে আসতেন। স্কুল থেকে ফিরে দুধ ভাত খাবার অভ্যাস ছিল এবং সকলকেই নিয়ে তিনি খাবার খেতেন। দাদির কাছে শুনেছি, আব্বার জন্য মাসে কয়েকটি ছাতা কিনতে হতো। কারণ আর কিছু নয়, কোন ছেলে গরিব, ছাতা কিনতে পারে না, দূরের পথ, রোদ বা বৃষ্টিতে কষ্ট হবে দেখে তাকে ছাতা দিয়ে দিতেন। এমনকি পড়ার বই মাঝে মাঝে দিয়ে আসতেন। আমার দাদা-দাদি অত্যন্ত উদার প্রকৃতির ছিলেন। আমার আব্বা যখন কাউকে কিছু দান করতেন তখন কোনদিনই তাঁকে বকাঝকা করতেন না, বরং উৎসাহ দিতেন। আব্বার একজন স্কুল মাস্টার ছোট্ট একটি সংগঠন গড়ে তুলে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ধান, টাকা, চাল যোগাড় করে গরীব-মেধাবী ছেলেদের সাহায্য করতেন। অত্যন্ত সক্রিয় কর্মী হিসেবে তিনি তাঁর সঙ্গে কাজ করতে এবং অন্যদের উৎসাহ দিতেন। যেখানেই কোনো অন্যায় দেখতেন সেখানেই তিনি প্রতিবাদ করতেন।'*

বঙ্গবন্ধুর মানবিক গুণাগুণের অন্যতম আরোও একটি উদাহরণ, তিনি যখন গোপালগঞ্জ মুসলিম সেবা সমিতির সম্পাদক হন, তখন তাঁর নেতৃত্বে 'মুষ্টিভিক্ষা'র মাধ্যমে টাকা সংগ্রহ করে গরীব ছাত্রদের আর্থিক সহযোগিতার ব্যবস্থা করেছিলেন।

একবার দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিলো। কৃষি মাঠে ভালো ফসল হয়নি। শেখ মুজিব তখন গোপালগঞ্জে থাকেন। গ্রামের বাড়িতে গেলেন বেড়াতে। এলাকার মানুষ অর্ধাহারে-অনাহারে দিন কাটাচ্ছে। চতুর্দিকে দুর্ভিক্ষ, মুজিব আর স্থির থাকতে পারলেন না। সেদিন বাড়িতে কেউ নেই। বাবা লুৎফর রহমান গেছেন পাটগাঁও পোস্ট অফিসে। ফিরতে অনেক দেরি হবে। এই সুযোগে তিনি গ্রামের লোকজনদের ডেকে নিজের গোলার ধান বিলিয়ে দেন। এ ধরনের কাজ করায় তাঁর পিতা জানতে চেয়েছিলেন কারণ কী? মুজিব বলেছিলেন, 'এবার চাষিদের ধান সব বন্যায় নষ্ট হয়ে গেছে। আকালে পড়েছে কৃষক। আমাদের মতো ওদের পেটেও ক্ষুধা আছে। ওরাও বাঁচতে চায়।' বাবা, ছেলের এই সৎসাহস ও মহানুভবতা দেখে খুশি হন।

মানবিক গুণাবলির সবচেয়ে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ৭ই মার্চের ভাষণের বর্ণিত অংশটুকু, 'আজ বাংলার মানুষ মুক্তি চায়, বাংলার মানুষ তার অধিকার চায়।' বঙ্গবন্ধু 'সমাজতন্ত্র' ও 'ধর্মনিরপেক্ষতা' প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সকল ধর্ম-বর্ণের মানুষের প্রতি ন্যায় বিচার করেছিলেন। দেশবাসীকে তিনি সম্বোধন করতেন, 'ভাইয়েরা আমার' বলে। যা মানবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

'অনন্য মহামানব' প্রবন্ধে লেখক মাহবুব তালুকদার বঙ্গবন্ধুর মানবিকতার বর্ণনা দিতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন, 'পঁচাত্তর সালের ৭ই মের ঘটনা। বঙ্গবন্ধুর পিতার চেহলামে যোগ দিতে আমরা টুঙ্গিপড়ায় যাই। এ যাত্রা তিনি নিজেই আমাকে সঙ্গে যেতে বলেছিলেন। 'গাজী' জাহাজে আমরা রওনা হই। বাণিজ্যমন্ত্রী খোন্দকার মোশতাক আহমেদ, পানি উন্নয়ন ও বন্যা নিয়ন্ত্রন মন্ত্রী আবদুর রব শের নিয়াবাত, তথ্যমন্ত্রী এম কোরবান আলী, রাষ্ট্রপতির বিশেষ সহকারি তোফায়েল আহমেদ, শেখ ফজলুল হক মনি ছাড়াও তিন বাহিনীর প্রধান এবং অনেক আওয়ামী লীগ নেতাকর্মী আমাদের সঙ্গে ছিলেন। মন্ত্রী ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা ছোটো ছোটো কেবিনে চলে গেছেন। অনেকেই ডেকে শয্যা পেতেছেন। কেবল আমারই শোয়ার ব্যবস্থা নেই। ডাইনিং স্পেসে একটি সোফা পাতা ছিল। ভাবলাম ওটার ওপর শুয়ে পড়ব। ইতোমধ্যে রাষ্ট্রপতির এডিসি গোলাম রব্বানীর ব্যাটম্যান এসে একটা হোল্ডল বিছিয়ে দিয়ে গেল। রব্বানী সৌজন্যবশত জিজ্ঞেস করল, স্যার। আপনি কি এতে শেয়ার করবেন? আমি জানালাম, আমি সাফাতেই রাত কাটিয়ে দেবো। এরমধ্যে ভাগ্যাহত

আরেকজন জুটল। তিনি গোলাম মাহবুব, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার বিশেষ সংবাদদাতা। রাত ১১ টার দিকে জাহাজের দুলুনিতে ঘুমিয়ে পড়লাম। যখন ঘুম ভাঙল, তখন মধ্যরাত। হঠাৎ টের পেলাম আমার মাথার নিচে বালিশ। শোয়ার সময় হাতের কনুই মাথার তলে রেখে শুয়েছিলাম। এখন বালিশ এলো কোত্থেকে? আমি শোয়া থেকে উঠে বসলাম। দেখলাম এডিসি রব্বানি তখনও জেগে। এমনকি গোলাম মাহবুবও সজাগ হয়ে বসে আছেন। আমি এডিসিকে বললাম, রব্বানী! বালিশ এল কোত্থেকে? গোলাম রব্বানী জানাল, 'বালিশ বঙ্গবন্ধু দিয়ে গেছেন। রাত সাড়ে ১২ টার দিকে বঙ্গবন্ধু রাউন্ডে বেরিয়েছিলেন। কে কোথায় কী অভাবে শুয়েছেন, ঘুরে ঘুরে তা দেখেন। আমার সামনে এসে বললেন, মাহবুব এভাবে শুয়ে আছে। একটা বালিশ ওরে যোগাড় করে দিতে পারলা না?' এই প্রবন্ধে বঙ্গবন্ধুর মানবিক গুণাবলির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে।

বঙ্গবন্ধুর উদার হৃদয়, মানুষের প্রতি দয়া, প্রাণীর প্রতি মহত্ব ওঠে এসেছে তাঁর লেখা 'কারাগারের রোজ নামচা' গ্রন্থের ৪৬ পৃষ্ঠায়। যেখানে তিনি উল্লেখ করেছেন, 'আমার ঘরের কাছের আম গাছটিতে রোজ ১০-১১ টার সময় দুইটা হলদে পাখি আসে। আমি ওদের খেলা দেখি। ওদের আমি ভালোবেসে ফেলেছি বলে মনে হয়।' তাঁর এই বাক্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে, বঙ্গবন্ধু যেমন দেশের মানুষকে ভালোবেসেছেন, তেমনি এদেশের ভূ-প্রকৃতি ও প্রাণিকূলের প্রতিও তাঁর তেমন হৃদয় উদার করা ভালোবাসার স্রোত প্রবাহিত ছিল। বঙ্গবন্ধু সত্যিকার অর্থেই আকাশসম উদার ছিলেন বলেই কিউবার অধিপতি ফিদেল কাস্ত্রো অকপটে উচ্চারণ করেছিলেন, 'আমি হিমালয় দেখিনি, তবে আমি শেখ মুজিবকে দেখেছি।' ■

কথাসাহিত্যিক ও শিশু সংগঠক

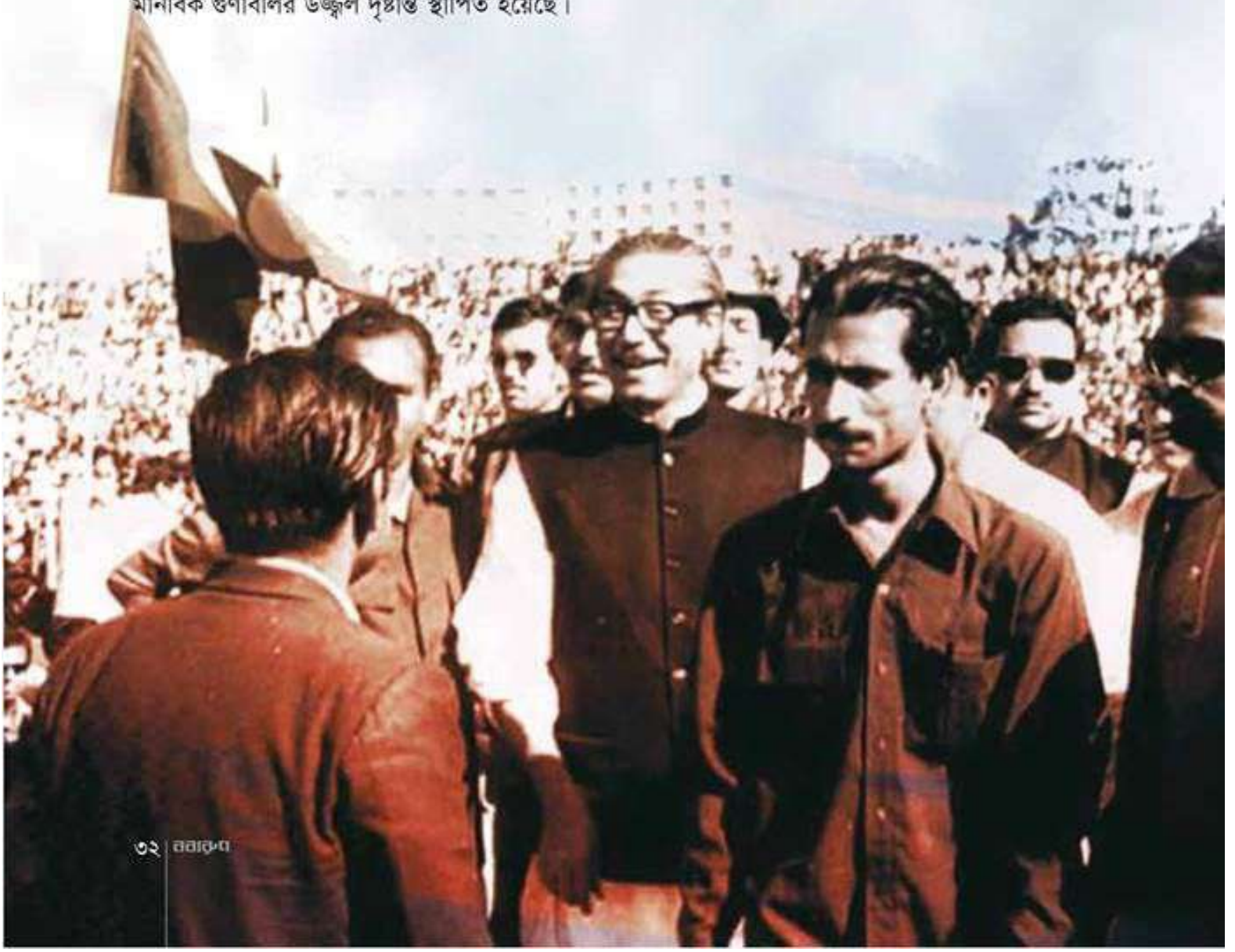

মোহাম্মদ ইউসুফ তুর্য, সপ্তম শ্রেণি, জুনিয়র এইড ইংলিশ ভার্সন স্কুল, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

সাবিহা তাসবিহ, অষ্টম শ্রেণি, বিএএফ শাহীন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

গল্প

একাত্তরের শিশু

তৌহিদ-উল ইসলাম

পাকিস্তানি ভদ্রলোক এর আগেও নাকি আমাদের গ্রামে এসেছিলেন। তবে কখনো কোথাও তিনি মাইকে বক্তব্য দেননি। এবারই প্রথম বক্তব্য দেবেন আমাদের স্কুলের বিজয় দিবসের আলোচনা সভায়। এ সভায় তিনি প্রধান অতিথির বক্তব্য দেবেন। তবে তাকে প্রধান অতিথি করায় হেডস্যার পড়ে গেছেন বিপাকে। সকালবেলা কয়েকজন কলেজ পড়ুয়া ছাত্র এসে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সম্পর্কে অভিযোগ তুলেছেন। হেডস্যারের বিশ্বস্ত কর্মচারী কানাই দার কাছে আমরা এ ব্যাপারে জানতে পারি। ছেলেরা যা বলে গেছে তার বর্ণনা দিতে গিয়ে কানাই দা অভিনয় করে বলল, পাকিস্তান আমাদের শত্রুপক্ষ। স্বাধীনতার শত্রু। তাই বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে তাকে প্রধান অতিথি করা উচিত হয়নি। এ রকম বলেছিল ছেলেরা।

হেডস্যার পালটা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন, প্রধান অতিথির বক্তব্য শোনার পর এ বিষয়ে তার সাথে কথা বলতে হবে। তার আগে তিনি কিছুই বলবেন না এবং কেনোভাবেই তিনি তার সিদ্ধান্ত পালটাবেন না। ছেলেরা হেডস্যারের কথা মেনে নিয়ে এবং অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার পক্ষে মত দিয়ে চলে গেছেন। তবে চলে যাবার সময় কেউ কেউ হেডস্যার সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করেছেন।

কানাই দার কাছে বিষয়টি শোনার পর আমরা ক্লাস টেনের কয়েকজন ছেলে হেডস্যারের পক্ষ নেওয়ার জন্য তাঁর কক্ষে পৌছালাম। আমরা ঐ সব কলেজের বখাটে ছেলেদের হাত-পা ভেঙে দেওয়ার জন্য হেডস্যারের সম্মুখে কঠোর মনোভাব ব্যক্ত করলাম। তবে হেডস্যার আমাদের কথায় খুশি হলেন না। তিনি আমাদেরকেও একই কথা শোনালেন। প্রধান অতিথির বক্তব্য শেষে এ বিষয়ে কথা বলা যাবে।

আমরা দমে গেলাম। তবে আগ্রহ বেড়ে গেল। দেখি তাহলে কী বক্তব্য পেশ করেন আমাদের পাকমশাই।

এমন সময় রুবেল প্রশ্ন তুলল, পাকমশাই বাংলায় বক্তব্য দেবেন তো? পাকিস্তানের ভাষা তো উর্দু।

তাই তো! ব্যাপারটা নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। তপুকে পাঠানো হলে কানাই দার কাছে। সে ঘুরে এসে জানালো, হেডস্যার নাকি বলেছেন উনি পাকিস্তানি বাঙালি। ওনার মাতৃভাষা বাংলা।

আমরা সবাই তখন পাক-বাঙালির বক্তব্য শোনার অপেক্ষায় রইলাম।

এশার নামাজ শেষ হলো। আলোচনা অনুষ্ঠান শুরু করার ঘোষণা দিলেন মতিন স্যার। আড়াই মিনিটের স্বাগত বক্তব্য দিলেন হেডস্যার। তবে প্রধান অতিথি সম্পর্কে তিনি কিছুই বললেন না। বাংলাদেশের সুবর্ণ জয়ন্তী ঘিরে সরকারের উন্নয়নের কিছু কথা শুনিয়ে বক্তব্য শেষ করলেন।

এবার পাকমশাই উঠে দাঁড়ালেন। শুরু হলো বক্তব্য–

শুভ রাত্রি! আমার বাঙালি বন্ধুরা, মহান বিজয়ের মাসে লক্ষ লক্ষ বাঙালি শহিদের প্রতি আমার হৃদয়ের পরম শ্রদ্ধা জানিয়ে শুরু করছি বঙ্গবন্ধুর নামে। যে নামে

বাংলাদেশের স্বাধীনতার দুয়ার খুলে যায়। আমি বক্তব্য দিতে জানি না। আমি বক্তব্য দিতে পারি না। শুধু আমারই জন্মের কথা, আমারই বেড়ে ওঠার কথা আপনাদের শোনাতে চাই। আর এ সুযোগটি করে দেওয়ার জন্য এ স্কুলের হেডমাস্টার খোরশেদুজ্জামান মহাশয়কে সবিনয়ে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

বন্ধুরা, বলছি শুনুন। বাংলাদেশের এই জেলার পারুলিয়া আমার জন্মস্থান। বড়ো হয়েছি পাকিস্তানের রাওয়ালপিণ্ডিতে। পারুলিয়ার অনেকেই হয়ত এখানে আছেন। আপনারা আমার কথা শুনে হয়ত বিশ্বাস করতে চাইবেন না। আর আমার হাতেও তেমন প্রমাণ নেই। আমার বয়স এখন পঞ্চাশ বছর। বাংলাদেশের বয়সের সমান। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় আমার বয়স ছিল এক বছরের নিচে। রাওয়ালপিণ্ডিতে আমার বাবা ছিলেন একজন ট্যাক্সি ড্রাইভার। বছর পাঁচেক হলো তিনি পরলোকগমন করেছেন। ট্যাক্সি ড্রাইভার বাবার আদর্শে আমি বড়ো হয়েছি, রাও ফরমান আলীর আদর্শে নয়। এবার আমি ট্যাক্সি ড্রাইভার আমার বাবা শমসের আলীর লেখা আত্মজীবনী থেকে কিছু অংশ পাঠ করে শোনাচ্ছি। এই পর্যন্ত বলে পাকমশাই একটা বই খুলে পড়তে শুরু করলেন।

'আমি তখন ফ্রন্টিয়ার ফোর্স রেজিমেন্টের পাঠান জেসিও। আমাদের রেজিমেন্টকে বিমানে করে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হলো। বলা হলো, এখানে হিন্দু কাফেরদের মারতে হবে। এপ্রিল মাসে একদিন আমরা একটা গ্রাম ঘিরে ফেলি। তখন আদেশ পেলাম, এখানে যত কাফের আছে সবাইকে দ্রুত মেরে ফেলতে হবে। কিন্তু গ্রামে ঢুকে দেখি, মহিলারা পবিত্র কোরআন শরিফ পাঠ করছেন, আর পুরুষেরা নফল নমাজ আদায় করছেন। তবে তাদের ভাগ্য ছিল খারাপ। অযথা সময় নষ্ট না করার নির্দেশ দিলেন আমাদের কমান্ডিং অফিসার।

এর কয়েকদিন পরে আমরা কালীগঞ্জ নামের ছোট্ট একটা থানায় পৌছালাম। উপর থেকে নির্দেশ পেয়ে কিছু লোককে ধরে এনে তাদেরকে দিয়ে একটা বাজার লুট করি। এ কাজে প্রায় শতাধিক লোককে ধরে এনেছিলাম। তারা যখন বাজার লুট করছিল তখন সেনাবাহিনীর ফটোগ্রাফাররা তাদের ছবি তুলছিল। এরপর লোকগুলোকে ধরে রেলসেতুর পাশে ভোটমারী নামক জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়। রাতে তাদেরকে দিয়ে তাদের নিজ নিজ কবর খোঁড়ানো হলো। ভোরবেলা সবাইকে গুলি করে ফেলে দেওয়া হলো নিজেদের খনন করা কবরে। কয়েকজন পাঠান সৈন্য গুলি চালাতে অস্বীকার করলে তাদেরকে পশ্চিম পাকিস্তানে ফেরত পাঠিয়ে দেওয়া হলো। দিন দুয়েক পরে সেই গণকবরের পাশ দিয়ে আমরা যাচ্ছিলাম। দেখি, ছোট্ট একটা মেয়ে সেই গণকবরের পাশে বসে আছে। অথচ আমাদের ভয়ে ঐ এলাকার সমস্ত লোক আগেই পালিয়ে গিয়েছিল। মেয়েটিকে দেখে আমি খুব লজ্জা পেলাম। হয়ত এখানে সে তার আপনজনদের খুঁজতে এসেছে। তবে আমার জীবনের সবচেয়ে অসহনীয় ঘটনাটি ঘটে পারুলিয়ায়।'

এ পর্যন্ত বলে কী মনে করে যেন পাক ভদ্রলোক একটু থেমে গেলেন। দর্শকদের দিকে চোখ তুলে এক ঝলক তাকিয়ে নিলেন। তারপর পুনরায় পড়তে শুরু করলেন।

'পারুলিয়ায় নাকি মুক্তিফৌজদের আস্তানা। আমাদের উপর নির্দেশ হলো, ঐ পুরো এলাকা থেকে মুক্তিফৌজদের হটিয়ে দিতে হবে। ওখানে পাঞ্জাব রেজিমেন্টের একটি কোম্পানি আগে থেকেই তল্লাশি অভিযান চালিয়ে আসছিল। তাদেরকে কিছু সময়ের জন্য অব্যহতি দিতে আমাদেরকে সেখানে পাঠানো হলো।

আমরা প্রথম যে গ্রামটি অতিক্রম করেছিলাম, সেখানকার সবকিছুই ঐ পাঞ্জাব রেজিমেন্টের সৈন্যরা একেবারে পুড়িয়ে দিয়েছিল। অধিকাংশ লোকই গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেছে। যারা পালাতে পারেনি, তাদেরকে মরতে হয়েছে। বৃদ্ধ, নারী,পুরুষ ও শিশুর কয়েকটা লাশ আমাদের চোখে পরল। এরপর ভবানীপুর, বড়খাতাসহ পাঁচটি গ্রাম অতিক্রম করি আমরা। সব জায়গাতেই ছিল প্রায় একই দৃশ্য।

সন্ধ্যার সময় আমরা পারুলিয়া গ্রামে পৌছালাম। এখানে একজন তরুণ লেফটেন্যান্টের অধীনে পাঞ্জাব কোম্পানির নিকট থেকে আমাদের দায়িত্ব নেওয়ার কথা। অফিসার সাহেব তখন একটি পুকুরের পাশে বসে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন আর সৈন্যরা রাইফেল পরিষ্কার করছিল। অনেক বেয়নেটে তখন রক্ত লেগেছিল। তরুণ অফিসার আমাদেরকে পুরো এলাকাটি সম্পর্কে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। তারপর দূরের কয়েকটা গ্রাম দেখিয়ে দিয়ে বললেন, সেখানে মুক্তিফৌজরা খুবই তৎপর।

আমাদের চারপাশে বাঙালিদের লাশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছিল। কয়েকজন আহত লোক যন্ত্রণায় গোঙাচ্ছিল। কয়েকটা ঘর থেকে তখনো ধোঁয়া উঠছিল। হঠাৎ একটা ঘর থেকে শিশুর কান্না ভেসে এল। ভেতরে গিয়ে দেখি, একজন বৃদ্ধ ও তিনজন মহিলার লাশ পড়ে আছে। মৃতদেহগুলোতে মারাত্মকভাবে বেয়নেট বিদ্ধ করা হয়েছিল। একটা মহিলার লাশের পাশে শুইয়ে একটা শিশু দুধ খাবার চেষ্টা করছে। লেফটেন্যান্ট সাহেব এক হাতে শিশুটাকে তুলে ধরে আমার সৈন্যদের উদ্দেশ্যে বললেন, আমি একে শূন্যে ছুঁড়ে দেওয়ার পর, ফিরে আসার মুহূর্তে তোমাদের মধ্যে কে আগে একে বেয়নেটে বিঁধতে পারবে?

আমার সাথের সৈন্যদের কেউ এগিয়ে যায়নি। তারা সবাই ছিল পাঠান। আমি দ্রুত শিশুটাকে লেফটেন্যান্টের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ভদ্রভাবে বললাম, সাহেব এ এলাকা এখন আমার অধীন। আপনি এখন আপনার কোম্পানি নিয়ে চলে যেতে পারেন।

জবাবে তিনি বললেন, বলো যে আমরা কেউ পারব না। এ পর্যন্ত আমরা কোনো কিছু মিস করিনি।

এরপর তিনি দলবল নিয়ে চলে যান। সে রাতেই আমি শিশুটাকে নিয়ে আমার রেজিমেন্ট ছেড়ে চলে আসি। চাকরি ছেড়ে দিয়ে হয়ে যাই ট্যাক্সি ড্রাইভার।'

এবার পাক বাঙালি বই থেকে চোখ তুলে বললেন, সেই একাত্তরের শিশুটি আমি। এই বাংলা আমার মা। জয় হোক সবার। শুভ রাত্রি।

নিস্তব্ধ জনতা। চোখের কোনায় ভোরের শিশির। তখনও অধীর আগ্রহ নিয়ে মঞ্চের সম্মুখে বসে আছেন সবাই। কেবল মঞ্চের পশ্চিম প্রান্ত থেকে পাঁচ-ছয়টি ছেলে উঠে হেডস্যারের চেয়ারের পাশে গিয়ে হাতজোড় করে কী যেন বলছেন। আমি ভালো করে দেখলাম, ওরা এলাকার কলেজপড়ুয়া ছাত্র। কানাই দা যাদের কথা বলেছিলেন। ■

সিনিয়র শিক্ষক (বাংলা), লালমনিরহাট সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়

গল্প

দ্যা গ্রেট ভোম্বল

মিলন বনিক

গোপালকে নিয়ে গোপালের মা বিন্দুবালার ভাবনার শেষ নেই।

সকাল-বিকাল ঠাকুরের কাছে কেবল একটাই প্রার্থনা, হে ঠাকুর, তুমি আমার গোপালকে বুদ্ধিশুদ্ধি দাও। তাকে মানুষ করে দাও। ছেলেটা দিন দিন কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে। তাকে তুমি রক্ষা করো ঠাকুর।

বয়স যত বাড়ছে, গোপালের ছেলেমানুষি ততই বাড়ছে। তার বয়সি ছেলে মেয়েদের মতো দুষ্টুমি করলে তাও হতো। তা না। তার স্থূল শরীরটা নিয়ে হাবাগোবা গোবেচারার মতো হা করে তাকিয়ে থাকবে। এমনভাবে তাকায় যেন কিছুই বুঝে না, কিছুই জানে না। মনে হয় কিছু যেন একটা খুঁজছে।

আজ সুড়সুড়ি দিলে তিন দিন পর সে হাসবে। খেয়াল হবে, গোপালের গায়ে সুড়সুড়ি পড়ছে। এজন্য বন্ধুরাও নাম দিয়েছে ভোম্বল। তা বন্ধুরা যতই নাড়ু গোপাল, কিংবা ভোম্বল কিংবা গাধা-গণ্ডার ডাকুক না কেন, তাতে গোপালের কিচ্ছু যায় আসে না। ভোম্বল শুধু চোখ বড়ো করে তাকায় আর মুচকি হাসে। তারপর হঠাৎ এমন কাণ্ড করে বসে যা কেউ ভাবতেও পারেনি। সবাই অবাক হয়ে যায়, ভোম্বল এমন কাজটা করতে পারল! মা-বাবা, কিংবা বন্ধুদের সাথে কথা বলছে তো বলছে। তারপর হঠাৎ এমন হা করে তাকিয়ে থাকে, যেন কাউকে চিনতে পারছে না। সবাই অপরিচিত মুখ।

বাবা রমাপদের মফস্বলে মুদির দোকান। তাও বাড়ি থেকে সাত-আট মাইল হবে। রমাপদ দু-তিন দিন পর পর বাড়ি আসে। এসেই গোপালকে বোঝায়। তোকে লেখাপড়া শিখতে হবে। ব্যাবসা করলেও লেখাপড়া জানতে হবে। তোর বন্ধুরা দেখ, কী সুন্দর করে বই নিয়ে স্কুলে যায়। তোকেও স্কুলে যেতে হবে। ভালোমতো লেখাপড়া করতে হবে। আমি তোর জন্য সুন্দর একটা ব্যাগ নিয়ে আসব। তুই ব্যাগ কাঁধে নিয়ে স্কুলে যাবি। গোপাল খুশি হয়ে বলে, আচ্ছা যাবো।

এমন বোকার মতো আচরণে মায়ের যত দুশ্চিন্তা। বাবা রমাপদ সান্ত্বনা দিয়ে বলেন, সবার বুদ্ধি বিবেচনা তো আর এক সমান হয় না। গোপালের না হয় একটু কম। তাতে কী? আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে।

বুদ্ধিশুদ্ধি খোলার জন্য মাঝে মাঝে বিন্দুবালা কাজের কথা বলেন। এটা সেটা আনার জন্য বাজারে পাঠান। কিন্তু মুশকিল। আলু আনতে বললে চিনি, তেল আনতে বললে লবণ নিয়ে ঘরে ফিরে। এই নিয়ে বিন্দুবালার চিন্তার শেষ নেই। বটগাছের গুঁড়িতে সুতো বাঁধা থেকে মন্দির-মসজিদ যেখানে যা চোখে পড়ে, সেখানেই মানত করে বসে মা। গোপালের বুদ্ধিশুদ্ধিটা যেন ঠিকমতো হয়।

নতুন স্কুল ব্যাগ পেয়ে গোপালের আনন্দ দেখে কে? সমস্ত বই-খাতা ব্যাগে ভরে লাফাতে লাফাতে পরদিন ছুটল স্কুলে। বন্ধুরা গোপালের এই আনন্দ দেখে তো অবাক। এতটা হাসিমুখে গোপালকে স্কুলে আসতে কখনও কেউ দেখেনি।

সময়টা বর্ষাকাল। সকাল থেকে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। স্কুলের ক্লাসে গোপালের মনোযোগ দেখে স্যারেরাও অবাক। টিফিনে শুরু হলো মুষলধারে বৃষ্টি। তাতে গোপালের আনন্দ আরো বেড়ে গেল। বৃষ্টিটা সে ভালোই উপভোগ করছে। ছুটির সময় বৃষ্টি মাথায় নিয়ে গোপাল ছুটল বাড়ির দিকে।

উত্তরপাড়ার লাবুদের বাড়ির সামনে তালপুকুরের পাশ দিয়ে বয়ে গেছে ছোট্ট নদী। জোয়ারের পানি ঢুকছে পুকুরের সরু নালি দিয়ে। পানির স্রোতে অসংখ্য মলা-ঢেলা, পুঁটি-টাকি লাফিয়ে উঠছে উপর দিকে। গোপাল একমুহূর্ত দেরি করেনি। ব্যাগ থেকে সব বই-খাতা বের করে পুকুর পাড়ে রেখে ব্যাগের মুখ খুলে মেলে ধরল নাসির মুখে। দু-একটা মলা-ঢেলা-পুঁটি লাফিয়ে ঢুকছে ব্যাগের ভিতর। কাদা-জলে একাকার সারা শরীর।

যখন ব্যাগে ভরে কয়েকটা মাছ নিয়ে বাড়ি ফিরল বিন্দুবালা তো রেগে আগুন। হাতের কাছে রান্নার চামচ। তাই নিয়ে যখন মারার জন্য তেড়ে আসলো, গোপাল একটুও ভয় পায়নি। ফ্যালফ্যাল করে মায়ের দিকে তাকিয়ে আছে। অবাক করা নিষ্পাপ চাহনি। বিন্দুবালা হাত থেকে চামচ ফেলে দিয়ে গোপালকে বুকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠল।

সেদিন কলাগাছের ডগা আর বাঁশের কঞ্চি দিয়ে বন্ধুরা যুদ্ধ যুদ্ধ খেলছিল। সেই সাথে টুটন জানালো, ভুলুদের পেছনে পেয়ারা বাগান থেকে পেয়ারা চুরি করে খাবে। খুব মজা হবে। গোপাল কী করতে কী করে বসে, তাই নিয়ে সবার সংশয়। রিন্টু আপত্তি জানালো।

- ভোম্বলকে নেওয়ার দরকার নেই।

- কেন? আমিও যাবো। পেয়ারা খাবো। জানালো গোপাল।

- তাহলে আমরা যা বলব, তুই শুধু তাই করবি।

- আচ্ছা, তাই করব।

- দেখ, ধরা পড়ে গেলে কিন্তু সবার মার খেতে হবে।

- সে কী! মারবে কেন? ভয় পেয়ে বলল গোপাল।

- তো কি আদর করবে? রেগে বলল রিন্টু।

- কিচ্ছু হবে না। আমিও যাবো।

সবাই চুপি চুপি বাগানের দিকে এগুচ্ছে। টুটন, গোপাল ঢুকল বাগানের ভিতরে। রিন্টু দাঁড়িয়ে থাকল রাস্তার মাথায়। ভোলা বা তার পরিবারের কেউ এলে কলার ডগার বন্দুক উঁচিয়ে ট্যাঁ-ট্যাঁ-ট্যাঁ--ধু-রু-ম, ধু-রু-ম শব্দ করে সতর্ক করে দেবে রিন্টু। তাতে টুটন ও গোপাল পালিয়ে যেতে পারবে।

কথামতো, লিকলিকে টুটন গাছে উঠবে। গোপাল নিচে থেকে পাকা পেয়ারা কুড়িয়ে নেবে। টুটন বানরের মতো গাছের ডালে ডালে লাফাচ্ছে। অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে গোপাল। বাগানটা একটু ভিতরে। চারপাশে ঘন জঙ্গল। ঝোপঝাড়ে ভর্তি। বেশ কয়েকটা ঢাউশ সাইজের পেয়ারা প্যান্টের পকেটে গুঁজে নিয়েছে গোপাল। বাকি কিছু বেঁধে নিয়েছে গামছার কোনায়। নিচে থেকে গোপালও দেখিয়ে দিচ্ছে, এটা নয় ওটা, ওই যে ও-দিকে। এমন সময় রিন্টু ট্যাঁ-ট্যাঁ-ট্যাঁ--ধু-রু-ম, ধু-রু-ম শব্দ করে সংকেত দিল।

গোপাল অমনি চিৎকার করে উঠল, চোর চোর চোর। গাছের ডাল বেয়ে দ্রুত নেমে পড়ল টুটন। নেমেই গোপালকে বকা দিয়ে বলল, আমি যদি ধরা পড়ি তোকেও আস্ত রাখবে না। শোন, দুইজন একসাথে গেলে ধরা পড়ে যাবো। তুই ওদিকে যা, আমি এই পথে যাই। সোনাবিলে আমাদের দেখা হবে।

কে জানতো, উলটো পথে যেতে গিয়ে গোপালকে এমন বিপদে পড়তে হবে। ঘন ঝোপঝাড়ের ভিতর

পা দিয়েই আঁৎকে উঠল গোপাল। একদল লোক কাঁধে বন্দুক, রাইফেল, মাথায় গামছা বেঁধে বসে আছে। গোপালকে ভুঁড়ি দুলিয়ে আসতে দেখে বন্দুক তাক্ করল ওরা। গোপাল তাড়াতাড়ি পকেট থেকে পেয়ারাগুলো বের করে বলল, এই নাও, আমি আর চুরি করব না। কান ধরলাম।

হেসে উঠল দলের লোকেরা। একজন বলে উঠল,

- কী রে ভোম্বল? পেয়ারা চুরি করতে এসেছিস বুঝি?

গোপাল দেখল, এ তো আর কেউ নয়। গ্রামের ফরিদ কাকা। বুকে সাহস এল। সে জানে, ফরিদ কাকা মুক্তিযোদ্ধা। তবুও ভীতুর মতো জবাব দিল গোপাল–

- হুঁম।
- আর কে কে ছিল?
- রিন্টু, টুটন।
- ওরা কোথায়?
- ওদিকে পালিয়েছে।

এবার ফ্যালফ্যাল করে ফরিদ কাকার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে গোপাল। ফরিদ জিজ্ঞাসা করল,

- এদিকে কোথায় যাবি?
- সোনাবিলে। তোমরা কী করছ এখানে?
- যুদ্ধ করছি।
- ওমা! বসে বসে যুদ্ধ হয় নাকি? বন্দুক চালাবে না?
- চালাবো। শত্রুরা এলে তারপর চালাবো।
- আমাকে শেখাবে?
- কী করবি?
- আমিও যুদ্ধ করব। ও কাকা, দাও না তোমার বন্দুকটা। একটু ধরে দেখি।

- শুধু ধরে দেখলে হবে? চালানো শিখতে হবে না?

- হবে তো। তাহলে চালানো শিখিয়ে দাও না।

ফরিদ কাঁধের রাইফেলটা নামিয়ে গোপালের হাতে দিয়ে বলল,

- দ্যাখ। এইটা ট্রিগার। নিশানা ঠিক করে এইভাবে ট্রিগার টানতে হয়।

গোপাল সত্যি সত্যি ট্রিগারে টান দিল। ধুরুম করে বিকট একটা শব্দ হলো। দূরে বিলের মাঝখানে কাকতাড়ুয়ার যে কালো মাথাটা ছিল তা ঠাঁস করে ফেটে গেল। খুশিতে লাফিয়ে উঠল ভোম্বল। হাততালি দিয়ে বলে উঠল,

- আমি পেরেছি। আমি শিকার করতে পেরেছি।

ফরিদ চাচাসহ অন্যরা সবাই অবাক। এই ছেলের নিশানা একেবারে অব্যর্থ। একজন দাঁড়িওয়ালা কমান্ডার যোদ্ধা এসে ভোম্বলের পিঠ চাপড়ে সাহস দিয়ে বলল,

- তুমি যেটা মেরেছ, সেটা পাকসেনা। ওই যে পাশে আর একটা কাকতাড়ুয়া দেখছ, সেটা এদেশের রাজাকার। দেখি ওটাকে এক গুলিতে খতম করতে পারো নাকি?

- পারব।

এই বলে ভোম্বল অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তারপর কমান্ডার নিজের রাইফেলটা ভোম্বলের হাতে দিয়ে বলল,

- চালাও গুলি। ওয়ান-টু-থ্রি।

ধুরুম। ব্যাস। ঠাস করে ফেটে গেল কালো কুৎসিত জানোয়ারের মাথাটা। এবার মুক্তিসেনাদের সবাই জয় বাংলা স্লোগান দিয়ে আনন্দধ্বনি করে উঠল। দাড়িওয়ালা ক্যাপটেন আবারো গোপালের মাথায় হাত বুলিয়ে বলল,

- ভোম্বল দ্যা গ্রেট। যুদ্ধ করতে পারবি?

একমুহূর্ত না ভেবে ক্যাপ্টেনের চোখে চোখ রেখে সে বলল-

- পারব।

- ঠিক আছে। আজ বাড়ি যা। কাউকে কিছু বলবি না। প্রয়োজন হলে আমরা তোকে ডেকে নেব। আর খেয়াল রাখবি, আশপাশে খারাপ কিছু দেখলে দ্রুত আমাদের খবর দিবি। কিন্তু খুব সাবধানে। মনে থাকে যেন।

ঠিক আছে বলে গোপাল বেরিয়ে আসল। বাড়ি এসে দেখল, বাবা খুব উদ্বিগ্ন। বিষণ্ন মনে বসে আছে। এদিক-ওদিক দেখছে। গোপালকে দেখামাত্র জড়িয়ে ধরে বলল,

- এতক্ষণ কোথায় ছিলি। আমাদের সব শেষ হয়ে গেল বাবা। দোকানের মালামাল সব লুট করে নিয়েছে। পুরো বাজার জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে। শুনেছি ওরা এদিকেই আসবে। আমাদের ঘরবাড়ি ছেড়ে পালাতে হবে।

গোপালের মনে হলো এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর। নিশ্চয়ই ফরিদ চাচারা এই খবর জানে না। গোপাল আবার বেরিয়ে পড়ল। বাবা জিজ্ঞাসা করল,

- কোথায় যাচ্ছিস?

গোপাল শুধু বলল,

- কাকতাড়ুয়া মারতে।

রমাপদ ছেলের কথার আগামাথা কিছুই বুঝল না। ভাবল, পাগল ছেলের খামখেয়ালি। এখন গোপালকে বেশি কিছু বললে হিতে বিপরীত হবে।

খবরটা আগে থেকে জানা থাকলেও ক্যাপটেন গোপালকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলল,

- তুই একটা ভালো খবর এনেছিস। এই গ্রামে আসার আগে রেজুখালের সেতুর উপরে আমরা তাদের সবাইকে খতম করে দেবো। তুইও থাকবি আমাদের সাথে।

গোপাল বলল,

- আমি আসার সময় রমিজ চাচা কী সব আবোল-তাবোল বলছিল। লোকটা ভালো না। শয়তান।

- কী বলল?

- বলল, পালিয়ে যা ভোম্বল, পালিয়ে যা। এই গ্রামে থাকতে পারবি না। সবাইকে শেষ করে দেবো।

- ওসব নিয়ে তুই ভাবিস না। মাথায় হাত বুলিয়ে সাহস দিল ফরিদ চাচা।

রাতের অন্ধকারে রেজুখালের ওপারে এলোপাতাড়ি টর্চের আলো দেখে পুরো দলটা সতর্ক হয়ে উঠল। তবে কী ওরা এসেই পড়ল? ক্যাপটেন নির্দেশ দিল-সবাই তৈরি হও। সাথে সাথে যে যার মতো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে তৈরি। গোপাল ফ্যালফ্যাল করে বোকার মতো তাকিয়ে আছে ক্যাপটেনের মুখের দিকে। এই মুহূর্তে গোপাল কী করবে? ক্যাপটেনের চোখে চোখে গোপালের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি।

ক্যাপটেন গোপালের হাতে একটা নতুন রাইফেল তুলে দিয়ে বলল, এটা তোর জন্য। একজন শত্রুকেও জান নিয়ে ফিরে যেতে দিবি না।

তারপর ক্যাপটেন গোপালের মাথায় লাল-সবুজের পতাকাটা বেঁধে দিল। ■

শিশু সাহিত্যিক

গল্প

বঙ্গবন্ধুর স্মৃতি

অমিত কুমার কুণ্ডু

বাবা মতিঝিল সরকারি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। সে সুবাদে আমরা কমলাপুর রেল স্টেশনের অপর পাশে মায়াকানন থাকতাম। আমরা যে বাসায় থাকতাম তার নামটি ছিল ক্ষণিকালয়। ২৫ নম্বর বাসা। তাই কেউ বাসার ঠিকানা জানতে চাইলে বলতাম, ২৫ ক্ষণিকালয়, মায়াকানন, ঢাকা। ঠিকানাটি বাবাই শিখিয়েছিলেন।

যখনকার ঘটনা বলছি, তখন আমি ক্লাস ফাইভে পড়ি। বয়স এগারো বছর হবে। নতুন জীবন। নতুন পৃথিবী। চারিদিকের সবকিছু খুব রঙিন, খুব মনোরম। তখন পৃথিবীটাকে খুব সুন্দর মনে হতো। সবুজ মনে হতো। গাছের কচি পাতার মতো সবুজ। মিষ্টি, মোলায়েম সবুজ। তখন পৃথিবীটা বাধাহীন মনে হতো। আকাশের মতো মুক্ত মনে হতো। আকাশের উড়ন্ত বকের মতো স্বাধীন মনে হতো। মনে হতো জীবন শরতের সাদা মেঘের মতো সুন্দর। জীবন কচি ঘাসের মতো তুলতুলে। তখন সেই নবীন জীবনে আমরা বেড়ে উঠছিলাম তরতর করে। আমাদের বেড়ে উঠার সঙ্গী ছিল মুক্ত বাতাস। সুনীল আকাশ। আমাদের বেড়ে উঠার সঙ্গী ছিল আকাশের এক ঝাঁক বক। আমাদের বেড়ে উঠার সঙ্গী ছিল পাড়ার বন্ধুরা। আমার খেলার সাথিরা।

তখন প্রতিদিন বিকালে আমাদের কাজ ছিল খেলা আর খেলা। খেলার রাজ্যে হারিয়ে যেতাম আমরা। আমাদের বাসার নিচে অনেকটা খালি জায়গা ছিল। সেখানে খেলতাম আমরা পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে। গোল্লাছুট, কানামাছি কত না খেলা করতাম তখন। হুটোপুটি, ছোটাছুটিতে দিন কাটত আমাদের। বাড়ির খেলার ওই জায়গাটাতে অনেকগুলো গাছ ছিল। সেখানে ছিল নাড়িকেল, আম, কাঁঠাল, সজিনা ও একটি ছোট্ট পেয়ারা গাছ। আমি মাঝেমধ্যে পেয়ারা গাছে উঠে বসে থাকতাম। কচি পেয়ারা পেড়ে পেড়ে খেতে দিতাম খেলার সাথিদের। বিকেলে বন্ধুদের নিয়ে সেই সুমধুর সময় কাটছিল আমাদের। হাসিতে, খুশিতে, আনন্দে।

আমার খেলার সাথিদের একজন ছিল আবির। নাদুসনুদুস গোলগাল চেহারা। আমার সব থেকে ভালো বন্ধু। আমার প্রাণের বন্ধু। আবিরের বাবা একটা কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। বাবা বলতেন আবিরের বাবা একজন লেখক। তিনি শিশুদের জন্য লিখতেন। তিনি শিশুসাহিত্যিক ছিলেন। আঙ্কেলের সঙ্গে আমার প্রায়ই দেখা হতো। তিনি আমাকে অনেক আদর করতেন। নতুন কোনো বই বের হলে আমাকে তার একটা কপি দিতেন। মা ছোটোবেলায় সেসব বই আমাকে পড়ে পড়ে শুনাতেন। একটু বড়ো হলে আমি বই পড়তে শিখে যাই। যখন বই পড়তে শিখে ফেলি তখন আমার সে কী আনন্দ! সেই আনন্দ বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছিলেন আবিরের বাবা। যখন কেবল ভালোভাবে পড়া শিখেছি তখন আঙ্কেল আমাকে ভাষার গল্প নামে একটি বই দিয়েছিলেন। বইটি আমাদের মহান ভাষা আন্দোলনকে নিয়ে লেখা। আমি সেই প্রথম রফিক, শফিক, জব্বারের আত্মত্যাগের কথা জানতে পারি। ঐ ছোটো বয়সেও আমার চোখে জল চলে এসেছিল। বুক হু হু করে উঠেছিল। আহারে! ভাষার জন্য, মায়ের ভাষায় কথা বলার জন্য মানুষগুলো জীবন উৎসর্গ করে দিল!

আঙ্কেলের আরেকটিও ভালো গুণ ছিল। তিনি শিশুদের মনের কথা বুঝতে পারতেন। হয়ত লেখক বলেই এমন একটি গুণের অধিকারী তিনি ছিলেন। তিনি নিজের ছেলের মতো আমাকে ভালোবাসতেন। মাঝেমধ্যে চকলেট কিনে দিতেন। দেখা হলে বুকে জড়িয়ে ধরতেন। দেশের গল্প শোনাতেন। তিনিই প্রথম বঙ্গবন্ধুর ছবি আমাকে দেখিয়েছিলেন। আমার আদর্শকে চিনতে শিখিয়েছিলেন। জাতির পিতাকে জানতে শিখিয়েছিলেন।

একদিন পেপারে বঙ্গবন্ধুর ছবি বের হলো। তিনি পেপারটি হাতে নিয়ে আমাকে ডাকলেন। আমি কাছে গেলাম। আঙ্কেলের পাশে বসলাম। তিনি আমাকে পত্রিকায় ছাপা হওয়া ছবিটা দেখালেন। বললেন, 'বাবা, ছবিটার লোকটিকে তুমি চেনো? আমি বললাম, না। তিনি তখন বললেন, ইনি শেখ সাহেব। শেখ মুজিবুর রহমান। আমাদের ভবিষ্যৎ। তোমরা তো খুব ছোটো। তোমরা বুঝতে পারছ না। কিন্তু আমি বলছি, মিলিয়ে নিও, ইনি হবেন আমাদের মুক্তিদাতা। আমাদের জাতির পিতা। এই পাকিস্তান থাকবে না। পাকিস্তানের জাতির পিতাকে আমাদের মান্য করতে হবে না। আমরা স্বাধীন হবো। আমাদের স্বাধীন স্বদেশের নাম হবে বাংলাদেশ।' আমি ছবিটি দেখলাম। আঙ্কেলের সব কথা তখন ভালোভাবে বুঝতে পারলাম না। শুধু বঙ্গবন্ধুর ছবির দিকে তাকিয়ে থাকলাম। বুকের ভেতর আমরা স্বাধীন হবো কথাটি বারবার বাজতে থাকল। সেদিন ছিল ৮ই মার্চ। ১৯৭১ সাল। গতকাল সাতই মার্চে রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু ভাষণ দিয়েছেন। সেই উত্থিত শিরের ছবি, সেই বিশাল বুকের ছবি, সেই তর্জনী উঁচু করে পাকিস্তানের শাসকদের ভিত কাঁপিয়ে দেওয়া ছবি বের হয়েছে পত্রিকায়। অদ্ভুত সুন্দর লাগল বঙ্গবন্ধুর ছবিটি। ছবি দেখে আমি মুগ্ধ হলাম। শুধু আঙ্কেলের মুখের দুশ্চিন্তার কালো ছাপের কারণ ঠিকঠাক বুঝতে পারলাম না।

আঙ্কেলের কাছ থেকে এসে মনটা কেমন যেন হয়ে গেল। স্বাধীনতা শব্দটির মানে তখনও ঠিকভাবে বুঝতে পারিনি। তবুও বুকের মাঝে নাড়া দিতে থাকল। এভাবে হাসি-আনন্দ, দুরন্তপনা আর আঙ্কেলের স্নেহে আমার শৈশব কাটছিল। সদ্য কয়েক মাস হলো আমি ক্লাস ফোর থেকে ক্লাস ফাইভে উঠেছি। হঠাৎই এই মার্চ মাসে দেশটা কেমন যেন হয়ে গেল। পেপারে বঙ্গবন্ধুর ছবি দেখার দিন থেকেই যেন দেশটা নতুন নতুন লাগতে থাকল। মাঝেমধ্যে বাবা এসে বলতেন, দেশের অবস্থা ভালো না। চারিদিকে খুব আন্দোলন চলছে। শেখ মুজিব স্বাধীনতার ডাক দিয়েছেন। পাকিস্তানি সৈন্যরা ঢাকায় এসে ভরে যাচ্ছে। কী যে হবে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। বাবার কথা শুনে ভয়ে আমার গা শিউরে উঠত। পরপর কয়েকদিন আমরা স্কুলে গেলাম না।

বাবা কলেজে যেতেন, তবে বেশিক্ষণ থাকতেন না। মাঝেমধ্যে মিছিল দেখে আমার খুব ভয় করত। পাকিস্তানি মিলিটারিদের গাড়ি দেখে আরো ভয় করত। উর্দু ভাষায় তাদের কথা শুনলে মনটা খারাপ হয়ে যেত। আমি ভয় পেলে এক ছুটে মায়ের কাছে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরতাম। মায়ের বুকে মাথা রেখে

অনেকক্ষণ বসে থাকতাম। মায়ের মুখেও উৎকণ্ঠের ছাপ ছিল স্পষ্ট। মা মুখে কিছু বলতেন না, তবে ভেতরে ভেতরে বেশ ভয় পেতেন।

এর কয়েক দিন পর আবিরের জন্মদিন ছিল। দিনটি ছিল পঁচিশে মার্চ। আবিরের মা সকালে এসে আমাদের নিমন্ত্রণ করে গেলেন। রাত্রে আমরা আবিরের বাড়িতে খাব। আনন্দে আমার মনটা নেচে উঠল। আমি আবিরের বাড়ি যাব। আনন্দ করব। ভাবলেই আমার মনটা খুশিতে ভরে উঠল। এই উৎকণ্ঠার মধ্যেও মায়ের মুখ এদিন খুশিতে ভরে উঠল। মা আবিরকে আমার মতোই ভালোবাসতেন।

বাবা ওইদিন আবিরের জন্য খুব সুন্দর একটা লাল রঙের শার্ট কিনে আনলেন। আমি মনে কষ্ট পেতে পারি এটা ভেবে আমার জন্যও ঐ রকম একটা শার্ট কিনে এনেছেন। সন্ধ্যার পর আমরা আবিরের বাড়িতে গেলাম। শার্টটা পেয়ে আবির কী খুশি! এক দৌড়ে ভিতরের ঘরে চলে গেল। যখন ঘর থেকে বের হলো তখনও নতুন শার্টটি পরে রয়েছে। আবির বলল, ও এই শার্টটি পরেই রাত্রে ঘুমাবে। সন্ধ্যা রাত্রে আমরা অনেক আনন্দ করলাম। অনেক খাওয়া দাওয়া করলাম। জীবনের সবচেয়ে সুন্দর সন্ধ্যা ছিল সেই সন্ধ্যাটি। যখন বাড়ি ফিরে এলাম তখন প্রায় দশটা বেজে গেছে।

বাড়ি আসার পর জামা-প্যান্ট খুলে হাফ প্যান্ট পরলাম। ব্রাশ করে বেশিক্ষণ পড়তে পারলাম না। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার ঘুম এসে গেল। আমি গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে গেলাম। হঠাৎ প্রচণ্ড শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। চারিদিকে গুলির আওয়াজ, চিৎকার, চেঁচামেচি আর গাড়ির শব্দ। অনেকক্ষণ এরকম চলার পর চারিদিক ঠান্ডা নিস্তব্ধ হয়ে গেল। আমি মাকে জড়িয়ে ধরে থরথর করে কাঁপছি। ওই রাত্রে আমরা কেউ ঘুমাতে পারলাম না। ভয়ে শরীর ঠান্ডা হয়ে গেল। আতঙ্কে বাকরুদ্ধ হয়ে গেল।

পরদিন সকালে শুনতে পেলাম পাকিস্তানি মিলিটারিরা এসে আবিরের বাবাকে ধরে নিয়ে গেছে। আমি বাবা-মায়ের সঙ্গে ছুটতে ছুটতে আবিরের বাড়িতে গেলাম। আবিরের বাড়ি পৌঁছে আমার বুক ঠান্ডা হয়ে গেল। গলার স্বর স্তব্ধ হয়ে গেল। ওদের বাড়ি লণ্ডভণ্ড হয়ে রয়েছে। কিছুই আগের মতো নেই। গতকালের সেই সাজানো বাড়ি তছনছ হয়ে গেছে। আমি ভয়ে ভয়ে আবিরের শোবার ঘরের এলাম। এ কী! ঘরের ভিতর ঢুকেই বুক ভেঙে আমার কান্না চলে এল। মেঝেতে আবির শুয়ে আছে। ওর লাল জামাটা ছিদ্র হয়ে গেছে। জামার চারপাশে ছোপ ছোপ জমাট বাঁধা কালো দাগ। ■

শিশু সাহিত্যিক

সালাম হে জাতির পিতা

নিজামউদ্দীন মুন্সী

স্বাধীনতা তুমি আমায় করেছ
মুক্ত স্বাধীন বলাকা
শুষ্কদেহে প্রাণ দিয়েছ তুমি
হাতে দিয়েছ পতাকা।
স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রের
আজ আমি গর্বিত নাগরিক
এই পাওয়া যে পরম পাওয়া
হীরা-মণি কাঞ্চনের অধিক
মুক্ত আকাশ মুক্ত হাওয়া
মুক্ত মুখের বোল
বঙ্গবন্ধুর দানের স্মৃতি
প্রাণেতে দেয় দোল।
শেখ মুজিবের দানের ফসল
সোনার বাংলাদেশ
নতশিরে জন্মদিনে
সালাম করি পেশ।

গল্প

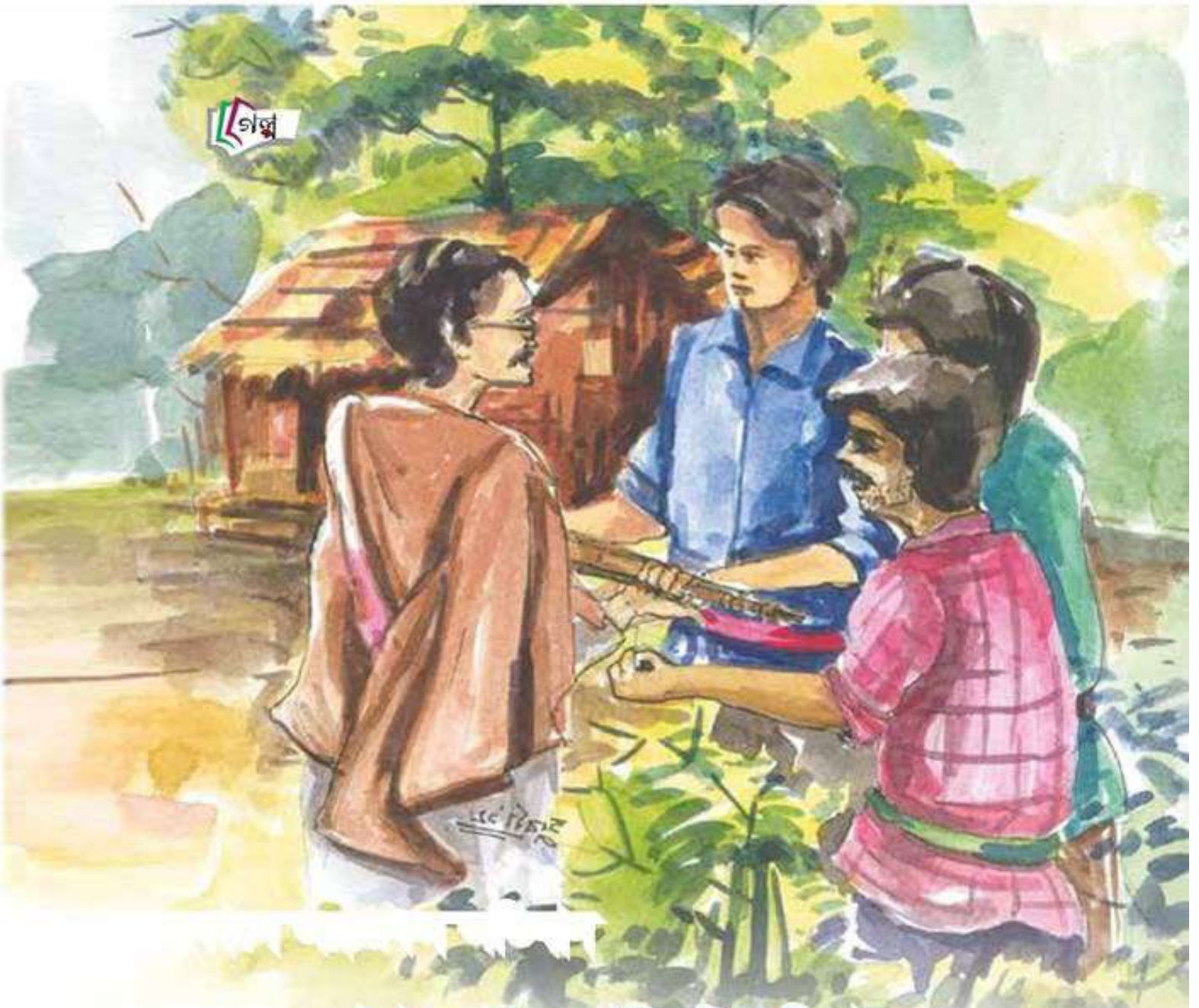

কমান্ডার আবদুল হামিদ উচ্চ বিদ্যালয়

শাকিব হুসাইন

স্কুলটার নাম কমান্ডার আবদুল হামিদ উচ্চ বিদ্যালয়। এই স্কুলের ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ে দিপু। ষষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি হয়ে দিপু পাঁচ মাস স্কুলে যায়নি । সামনে অর্ধ বার্ষিক পরীক্ষা দেখে আজ প্রথম স্কুলে এল দিপু। দিপুর পড়াশোনায় একটুকুও মন নেই। সারাদিন শুধু ঘুরে বেড়ানোর অভ্যাস তার।

আজ প্রথম স্কুলে এসে দেখল সবাই প্রাত্যহিক সমাবেশে জাতীয় পতাকার সামনে দাঁড়িয়ে জাতীয় সংগীত গাইছে । দিপুও লাইনে দাঁড়িয়ে গেল । কিন্তু জাতীয় সংগীত গাইল না। মাথায় শুধু একটা প্রশ্ন তার ঘুরপাক খাচ্ছিল। এই স্কুলটার নামটা আজব !

কীভাবে এই স্কুলের নাম কমান্ডার আবদুল হামিদ উচ্চ বিদ্যালয় হলো সেটা জানার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে গেল।

প্রাত্যহিক সমাবেশ শেষ করে সবাই নিজ নিজ ক্লাসে গেল। দিপুও তার ক্লাসে গেল। প্রথম পিরিয়ডে বাংলা ক্লাস হলো । এ রকমভাবে পর পর তিনটা ক্লাস হয়ে গেল। কিন্তু কোনো স্যারকে তার প্রশ্নটা জিজ্ঞেস

করতে পারল না। তারপর টিফিন হয়ে গেল। টিফিনের পর আবার ক্লাস শুরু হলো। এবার হবে বিজ্ঞান ক্লাস। বিজ্ঞান ক্লাস হলো। গণিত ক্লাস হলো। এবার শেষের পিরিয়ড। শেষের পিরিয়ডে আছে বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় ক্লাস। আবদুল মজিদ স্যার ক্লাসে ঢুকল। সবাই স্যারকে সালাম দিল। আবদুল মজিদ স্যার এই স্কুলের সবার প্রিয়। কারণ তিনি কখনো রেগে কথা বলেন না। সবসময় হাসি নিয়ে সবার সাথে কথা বলেন। কেউ কোনো বিষয় না বুঝলে তিনি গল্পের মাধ্যমে তা বুঝিয়ে দেন।

আবদুল মজিদ স্যার দিপুকে উদ্দেশ্য করে বলল , তুমি কি আজ নতুন এসেছ ?

দিপু জবাব দিল , জ্বি স্যার ।

-মনোযোগ সহকারে পড়াশোনা করবে, আবদুল মজিদ স্যার বললেন ।

আবদুল মজিদ স্যারের সুন্দর করে কথা বলা দেখে প্রশ্ন করার সাহস পেলো দিপু।

দিপু বলল , জ্বি স্যার । স্যার একটা প্রশ্ন করতে পারি?

আবদুল মজিদ স্যার বললেন, কেন নয়। অবশ্যই করতে পারো । আমি তো তোমাদের প্রশ্নের জন্যই অপেক্ষায় থাকি।

দিপু বলল , আচ্ছা স্যার। এই স্কুলের নাম কমান্ডার আবদুল হামিদ উচ্চ বিদ্যালয় হলো কীভাবে ?

আবদুল মজিদ স্যার বলল , খুব ভালো প্রশ্ন করেছ। এই স্কুলের নাম কীভাবে হলো তা সবার জানা জরুরি। তোমরা তো মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বইয়ে পড়েছ। তাহলে শোনো সবাই এই স্কুলের নামের ইতিহাস...

তখন ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ডাক দিলেন স্বাধীনতার। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীরা আমাদের উপর অস্ত্র , গোলাবারুদ নিয়ে হামলা করল। সেই রাতেই হাজার হাজার ঘুমন্ত মানুষকে হত্যা করল তারা। শুরু হয়ে গেল যুদ্ধ। মানে মুক্তিযুদ্ধ । পাকিস্তানি সেনারা শহরের পাশাপাশি হত্যাযজ্ঞ চালাতে লাগল গ্রামে গ্রামে।

তখন মে মাস । কয়েকজন মুক্তিযোদ্ধা এল আমাদের এই স্কুলে । তখন এটা স্কুল ছিল না । ছোটো একটা বাড়ি ছিল । চারদিকে ঝোপঝাড় ছিল । কারো জানা ছিল না যে এখানে একটা বাড়ি আছে। সেই সুযোগটাই কাজে লাগিয়েছিল মুক্তিযোদ্ধারা। তখন এই ছোটো বাড়িটাতেই সবাই থাকতে শুরু করল। মুক্তিযোদ্ধাদের দলের ক্যাপ্টেন ছিল কমান্ডার আবদুল হামিদ। যেমন তাঁর বুদ্ধি ছিল তেমন তাঁর অস্ত্র চালানোর দক্ষতাও ছিল। এই বাড়ি থেকেই আবদুল হামিদ প্রথম মিশন করল বিক্রমপুর গাঁয়ে। তিনজন রাজাকার ও দশজন মিলিটারিকে শেষ করে দিল আবদুল হামিদের বীর মুক্তিযোদ্ধারা। প্রথম মিশন তাদের সফল হয়ে গেল। এরপর এক এক করে হাটখোলার গাঁও, বিজয়পুর, নবীনগর এমন আরো কয়েকটি গ্রামে আবদুল হামিদের বীর মুক্তিযোদ্ধারা মিশন চালিয়ে পাক-হানাদার নিধন সফল করল ।

এ রকমভাবে তাদের এই বাড়িতে অনেকদিন কেটে গেল। তখন ডিসেম্বর মাস । যুদ্ধের শেষের দিকে । এই গ্রামের পাশের গ্রামে তিন পাড়া গাঁয়ে মিলিটারি ঘাঁটি গেঁড়েছে । এই খবর শুনে আবদুল হামিদ তার বীর মুক্তিযোদ্ধাদের প্রস্তুতি নিতে বললেন। পরের দিন তারা হামলা করল মিলিটারিদেরকে । দীর্ঘ সময় গোলাগুলির পর এক পর্যায়ে সকল মিলিটারি মারা গেল। হঠাৎ এক রাজাকারের গুলি এসে কমান্ডার আবদুল হামিদের বুকে লেগে গেল। সাথে সাথে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। এক মুক্তিযোদ্ধাকে গুলি করে মেরে ফেলল। তখন কমান্ডার আবদুল হামিদের রক্তে সবুজ ঘাস লাল হয়ে গেল। মুখে হাসি নিয়ে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন। দেশ স্বাধীন হলো। লাল-সবুজের পতাকা আকাশে পতপত করে উড়ছিল। মুক্তিযোদ্ধারা এই গ্রামেই তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে থাকা শুরু করল । এই বাড়িটাতে তারা শিক্ষা প্রসারের জন্য প্রাথমিক স্কুল চালু করল। নাম দিল তাদের দলনেতা বীর মুক্তিযোদ্ধার স্মরণে কমান্ডার আবদুল হামিদ প্রাথমিক বিদ্যাল । ধীরে ধীরে এটি উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হলো। এই হলো স্কুলের নামের ইতিহাস।

আবদুল মজিদ স্যারের চোখে জল। ক্লাসের সবার চোখেবা জল চলে আসে। দিপুর শীতল রক্ত গরম হয়ে উঠল

তারপর বলল, এতগুলা কথা আপনি কীভাবে জানলেন স্যার ?

আবদুল মজিদ স্যার বললেন, আমি জানি কারণ আমিও আবদুল হামিদের দলের একজন তরুণ মুক্তিযোদ্ধা ছিলাম।

সাথে সাথে সবাই বেঞ্চ থেকে উঠে স্যারকে স্যালুট করল।

দিপু বলল , স্যার আপনি একজন মুক্তিযোদ্ধা ! আপনি আমাদের দেশের সম্পদ । আমাদের গর্ব ও আমাদের অহংকার। স্যার আমি অনেক বড়ো ভুল করে ফেলেছি।

- কী ভুল করেছ দিপু? আবদুল মজিদ স্যার বললেন।

দিপু বলল, আমি আগে স্কুলে আসতে চাইতাম না স্যার। জাতীয় সংগীত গাইতাম না। কিন্তু এখন থেকে আমি প্রতিদিন স্কুলে আসব। প্রতিদিন প্রাত্যহিক সমাবেশে যোগ দিয়ে জাতীয় সংগীত গাইব। আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিয়েন স্যার।

- কী বলো দিপু। তুমি খুব ভালো ছেলে। তোমার জানার আগ্রহ অনেক বেশি। তোমার মতো সবার জানার আগ্রহ থাকতে হবে। সবাইকে জানতে হবে মুক্তিযুদ্ধের গল্প, মুক্তিযোদ্ধাদের গল্প।

আবদুল মজিদ স্যারের কথা শেষ হতেই ছুটির ঘণ্টা বেজে উঠল । সবাই লাইন ধরে ক্লাস থেকে বের হয়ে এল। ষষ্ঠ শ্রেণির সবাই জাতীয় পতাকার সামনে গিয়ে জাতীয় পতাকাকে স্যালুট করল । তাদের দেখাদেখি পুরো স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক ও শিক্ষিকা জাতীয় পতাকাকে স্যালুট করল। লাল-সবুজের পতাকা তখন আকাশে পতপত করে উড়ছে। ■

একাদশ শ্রেণি, দিনাজপুর সরকারি কলেজ, পাকেরহাট, দিনাজপুর

গল্প

লাবুর স্বাধীনতা ভাবনা

প্রণব মজুমদার

সুমনের সঙ্গে লাবুর অনেক দিন দেখা নেই। বছর পাঁচেক আগে দেখা। ব্যস্ততার কারণে ওর সঙ্গে লাবুর কথা বলা হয়নি। সুমন লাবুর মামাতো ভাই। দুতিন বছরের ছোটো। মহানগরের মানুষ যেমন কর্মব্যস্ত, তেমনি লাবুও। সময়ের চাকার সঙ্গে লাবুকেও ঘুরতে হয়! সারাদিন একটানা পরিশ্রম ছাড়াও সাংসারিক নানা ঝামেলার মাঝে ওর দিন কাটে।

বেশ কিছুদিন হলো সুমনের চিঠি এসেছে। সুমন লিখেছে ওদের বাড়িতে যাওয়ার জন্য। আর গেলে মামি খুবই খুশি হবেন। তাই কাল মালিকের কাছে সে দু-দিনের ছুটি চেয়েছিল, কিন্তু কাজ হয়নি। প্রতি বছরই চৈত্রের গরমে লাবুরা মামার বাড়ি চাঁদপুরে বেড়াতে যায়। এ সময় অন্য কেউ মামার বাড়ি না গেলেও সাবু ভাই যেতই! লাবু তার মামার কাছে তা শুনেছে। সাবু হলো লাবুর বড়ো ভাই। কখনও চোখে দেখেনি সে। তিনি কেমন ছিলেন, কী রকম ছিলেন এবং কীভাবে সাবু হারিয়ে গেলেন এসব কথা লাবু রমিজ মামা ও মায়ের কাছে শুনেছে। চৈত্র মাস আসলেই মায়ের বুকে অশ্রুধারা নেমে আসে। জেগে ওঠে ২৬শে মার্চের স্মৃতি। লাবুও চুপসে যায়। সে চায় না মায়ের বুক জুড়ে কান্না আসুক। মায়ের কাছে লাবু শুনেছে সাবু ভাই দেশকে খুবই ভালোবাসতেন। আর বাংলার প্রতি ওর ছিল আলাদা ভাব। তখন পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতায়, তাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে দেশে গণ-আন্দোলন,মিছিল আর সমাবেশ, এসব সভা-মিছিলে অংশগ্রহণ করত সাবুও। পশ্চিম পাকিস্তানের নির্যাতন ও অমানবিক আচরণে এখানকার মানুষ ফুঁসে ওঠে। অনেকদিন ধরেই নবকুমার ইনসটিটিউশনের ছাত্ররাও প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে পড়ে। সাবু করিম ছিলেন নবকুমার বিদ্যালয়ের নবম শ্রেণির ছাত্র। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতেই ছাব্বিশে মার্চ সন্ধ্যায় সে গুলিবিদ্ধ হয়। বাসার কাছেই বকশি বাজারের একটি গলির ধারে সাবু মাটিতে পড়েছিল। ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সাবু মারা যায়। বন্ধুরা তাকে বাসায় নিয়ে আসে। হঠাৎ বড়ো ভাইয়ের অকাল মৃত্যুতে লাবুদের পরিবারে দুর্যোগ নেমে আসে।

লাবু নিত্যদিনের মতো আজও ছাদের এক কোণে বসে এসব ভাবছিল। বিকেলের সূর্যাস্তের শেষ রশ্মিটা সারা শহরটাকে যেন লাল কৃষ্ণচূড়ার মতো দেখাচ্ছিল। সারা ঢাকা শহরটাকে যেন লাবুর কাছে বিষণ্ন লাগে। ইচ্ছে করে গ্রামে চলে যেতে। গ্রামের মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে যেতে ইচ্ছে করে তার। আস্তে আস্তে সন্ধ্যা নেমে আসে। ছোটো বোন লুনার ডাকে ওর চিন্তার বাঁধা পড়ে। লাবু ভাইয়া লাবু ভাই... এই...

তুমি।
-মা ডাকছে, শিগ্‌গির চলো কেনরে লুনা?
-জানি না।
লাবু উঠে দাঁড়ায়। লুনাকে নিয়ে ঘরে ফিরে।
-কী মা কেন ডাকছ?

হ্যাঁ রে কিছুক্ষণ আগে তোর ফেলু মামার বন্ধু এসেছিল। উনি ওনার চেম্বারে তোকে কাল দেখা করার জন্য বলেছেন!

-যেয়ে কী হবে মা।

আজ দুটি বছর ধরে একটা বালা চাকরি হচ্ছে না। তোর মালিক কালু শেক বালা মানুস না! আইজ ট্যাকা দেয় তো কাইল দেয় না!

লাবুর চাকরি ছেড়ে দিতে ইচ্ছে করে। পিতার অবর্তমানে সংসারের দিকে তাকিয়ে আজ ওকে ওয়ার্কশপের কাজ করতে হচ্ছে।

-ফেলু মামার বন্ধু জহির সাবে আমাকে চাকরি দিবো ভাবছ তুমি! আরে উনি যদি চাকরি দিতেন তাহলে আমগো এত কষ্ট অইতো? মিছেমিছি ডাকাডাকি আর কি!

রাত গভীর হয়ে আসে। তুহিন, লোপা ও লুনা পড়া শেষ করে সবেমাত্র খেতে গেছে। লাবু খেয়ে তার বইগুলো নাড়াচাড়া করে। হঠাৎ দরজার কড়া নাড়ার শব্দ।

-কে, কে?
-আমি।
-আমি কে।
-আমি পার্থ।
নিঃশব্দে লাবু দরজা খোলে।

-এই যে তুই। তোকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে গেছি। আচ্ছা বল তো দেখি তোকে দিয়ে কী হবে। সারাদিন কাজ, কাজ আর কাজ। রাতেও তোকে পাই না।

-চল দেখি।

-কোথায়?

-কোথায় আবার। আজ তেইশে মার্চ, আর মাত্র দুদিন বাকি। তারপরই ছাব্বিশে মার্চ, বলি সেটা কি লাবু সাবের জানা নয়? লাবুদের পাড়ার ছেলে পার্থ লাবুর বন্ধু। বিত্তশালীর ছেলে পার্থ। ছেলে হিসেবে যাই হোক না কেন প্রতি বছরই সেও স্বাধীনতা ও সাবু ভাইয়ের মৃত্যু দিবস পালন করার চেষ্টা করে।

সব কাজ শেষ হয়ে গেছে, এখন শুধু রং দেওয়ার বাকি। মহল্লার বন্ধুরা মিলে তৈরি করা মুক্তিযোদ্ধাদের স্মৃতিসৌধে ফুল দেয়। পার্থের উদ্যোগে এবারও পবিত্র সে স্মৃতি মিনারে শহিদ সাবু করিমের উদ্দেশ্যে লাবুসহ বন্ধুরা ফুলের মালা দেবে। আয়োজন দেখাতে লাবুকে নেওয়ার জন্য পার্থ এসেছে। কিন্তু লাবু যেতে চাইছে না। দরজার কাছে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থাকে লাবু। আর কী যেন ভাবতে থাকে সে। লাবুর না যাবার কারণ খুঁজে পায় না পার্থ। পার্থর কৌতূহলী প্রশ্ন!

- কী ভাবছিস? স্বাধীনতার কথা?

মাথা নাড়ায় লাবু।

প্রায় সময়ই লাবু করিম স্বাধীনতার কথা ভাবে। সাবু ভাইয়ের কথা ভাবতে গিয়ে সে কেমন জানি জড়ো হয়ে যায়।

সাবু ভাই বেঁচে থাকলে ওদের সংসারে অভাব হতো না, আজ পার্থ ও অন্য বন্ধুদের সঙ্গে সেও মুক্ত চলাফেরা করত। নিয়মিত বিদ্যালয়ে যেত।

সাবু ভাইকে মনে করে মা ও লাবুরা দু'-দন পর অন্যদের মতো ভোরে শহিদমিনারে ফুল দিতে যাবে। এমনটা ভেবেই লাবুর চোখ থেকে পানি ঝরে। তা দেখে পার্থর চোখও ছলছল করে! ■

কবি ও কথাসাহিত্যিক

কবিতাগুচ্ছ

বীর জনতার মহান নেতা

সৈয়দ জাহিদ হাসান

তোমার নামেই ভোরের পাখি গাইবে গান,
তোমার নামেই শ্মশান ফুঁড়ে জাগবে প্রাণ।

তোমার নামে আকাশ হবে আলোকময়,
বাঙালির কেউ তোমার চেয়ে বড়ো নয়।
তুচ্ছরা সব করুক বড়াই, ক্ষতি নাই-
তুমি হলে মনের রাজা, আছো, রবে সর্বদাই।

তোমার নামেই ফাগুন মাসে হাসবে বন-
রক্তনদী সাঁতার দিয়ে আলোয় ভরে উঠবে মন।
সাহস তুমি, শক্তি তুমি, তুমি মিছিল- স্লোগান,
বীর জনতার মহান নেতা শেখ মুজিবুর রহমান।

আমি পড়ি বাবা পড়ে

সোহেল আমিন বাবু

আমি পড়ি বাবা পড়ে
উলটায় পাতা
পড়া শিখি ছবি দেখি
মেঘের ছাতা।
পাতায় পাতায় জ্বলে
আলোক লতা
বাবাটাও চুপচাপ
মাঝে নীরবতা!

কত কিছু দেখি আর
কত কিছু শিখি
মনের খাতায় আমি
সব কিছু লিখি।

সবুজ পাতার ডালে
পাখির গানে
আহা মন জেগে উঠে
দেশের টানে।

বঙ্গবন্ধু দিয়েছেন
এই দেশটাকে
এই দেশ আমাদের
অন্তরে থাকে।
ছবি দেখে বই পড়ে
কত কিছু জানি
এই দেশ আমাদের
হৃদয়ের রাণী।

মেঘের ছায়ায় হাসে
আমাদের মন
আমি পড়ি বাবা পড়ে
গড়তে জীবন।

বিশ্ব সেরা মুজিব

সৈয়দা সেলিমা আক্তার

ফুলের ঘ্রাণে
নদীর ঢেউয়ে
পাখির শিসে
বাংলাদেশের
লাল– সবুজে
আছো মিশে।

তোমায় হারা
করল যারা
জানে না তো
আর কেউ নয়
অতুল অমর
তোমার মতো।

তোমার জন্ম-
শতবর্ষ
শ্রদ্ধা ঘেরা
জাতির পিতা
মুজিব তুমি
বিশ্ব সেরা।

স্বাধীনতা

এস আই সানী

স্বাধীনতা আমার মায়ের খুঁজে পাওয়া নোলক,
স্বাধীনতা বঙ্গবন্ধুর ঝঙ্কারিত শোলক।

স্বাধীনতা আমার বোনের ঝুমকো কানের দুল,
স্বাধীনতা শিশিরমাখা শুভ্র শিউলি ফুল।

স্বাধীনতা নীল আকাশের মুক্ত বিহঙ্গ,
স্বাধীনতা পল্লীবালার কিশোরী অঙ্গ।

স্বাধীনতা কাজল দিঘির শানবাঁধানো ঘাট,
স্বাধীনতা হাওয়ায় দোলা সর্ষে ফুলের মাঠ।

স্বাধীনতা আমার গাঁয়ের ধুলোয় ভরা পথ,
স্বাধীনতা বিশ্বুকে লাল-সবুজের রথ।

স্বাধীনতা নদীর বুকে হাজারপালের নাও,
স্বাধীনতা নিঝুম রাতে পিদিম জ্বলা গাঁও।

স্বাধীনতা পল্লিবধূর নিটোল পায়ের নূপুর,
স্বাধীনতা বায়ান্নর ঐ রক্তঝরা দুপুর।

স্বাধীনতা একাত্তরের ভাই হারানো গান,
স্বাধীনতা জনম জনম স্মৃতিতে অম্লান।

সতেরোই মার্চ

আখতারুল ইসলাম

একটি শিশু জন্মেছিল সতেরোই মার্চ দিনে
দোয়েল-শ্যামা গান ধরেছে নতুন সুরের বীণে।
সেই শিশুটির মুখে হাসি ঘর করে সে আলো
বাবা- মা আর পাড়াপড়শি বাসে সবাই ভালো।

মধুমতি নদীর বুকে জাগলো সুখের ঢেউ
শেখ মুজিবুর নামটি রাখে প্রিয়জনের কেউ।
সূর্য হাসে রোদের ঠোঁটে গোলাপ বেলি ফোটে
পাতায় পাতায় কানাকানি আনন্দ ঢেউ ওঠে।

চতুর্দিকে সুর কলরব নাচছে সবুজ বন
প্রজাপতির রঙিন ডানায় উথলে ওঠে মন।
বাংলা জুড়ে সুখের জোয়ার সবার মুখে হাসি
কোলে তুলে বলল সবাই তাকে ভালোবাসি।

স্বপ্নরাঙা দু'চোখে তাঁর শুধু আলোময়
কে জানতো এই শিশুটি জয় বাংলার জয়।
হাসিমাখা মুখখানা তাঁর মুক্তো ঝরে ঘাসে
সেই শিশুটি বঙ্গবন্ধু সরব ইতিহাসে।

গর্বের ধন

অনার্য আমিন

আমার আছে এক গর্বের ধন
তোমরা কি তা জানো?
আমার আছে লাল ইতিহাস
বিশ্বকে চমকানো।

আমার আছে স্বাধীনতা
জীবন থেকেও দামি
দূর করেছি ভিনদেশি সেই
শাসকের ভণ্ডামি।

আমার আছে ভাষার গল্প
বিজয় দিনের গান
আরো আছে গড়তে স্বদেশ
সংগ্রামী অভিধান।

আমার কোনো দুঃখ নেই
হারানোর কিছু আর
প্রতিটি দিন আসবে রঙিন
নতুন সম্ভাবনার।

সোনার বাংলা

আজহার মাহমুদ

মাগো আমি যুদ্ধে যাব
দাও না দোয়া করে,
ফিরব মাগো পতাকা নিয়ে
যদি না যাই মরে।

বাংলা মাকে স্বাধীন করে
আসব তোমার বুকে,
খালা তুমি থেকো পাশে
আমার মায়ের দুঃখে।

যুদ্ধে গিয়ে যদি মাগো
ফিরে আর না আসি
যদি আমি ধরা পড়ে যাই
দেয় ওরা ফাঁসি

তবুও মাগো আমার মুখে
থাকবে সুখের হাসি।
বলবো আমি চিৎকার করে,
সোনার বাংলা তোমায় ভালোবাসি।

গল্প

টুলটু গুলটু

কাজী কেয়া

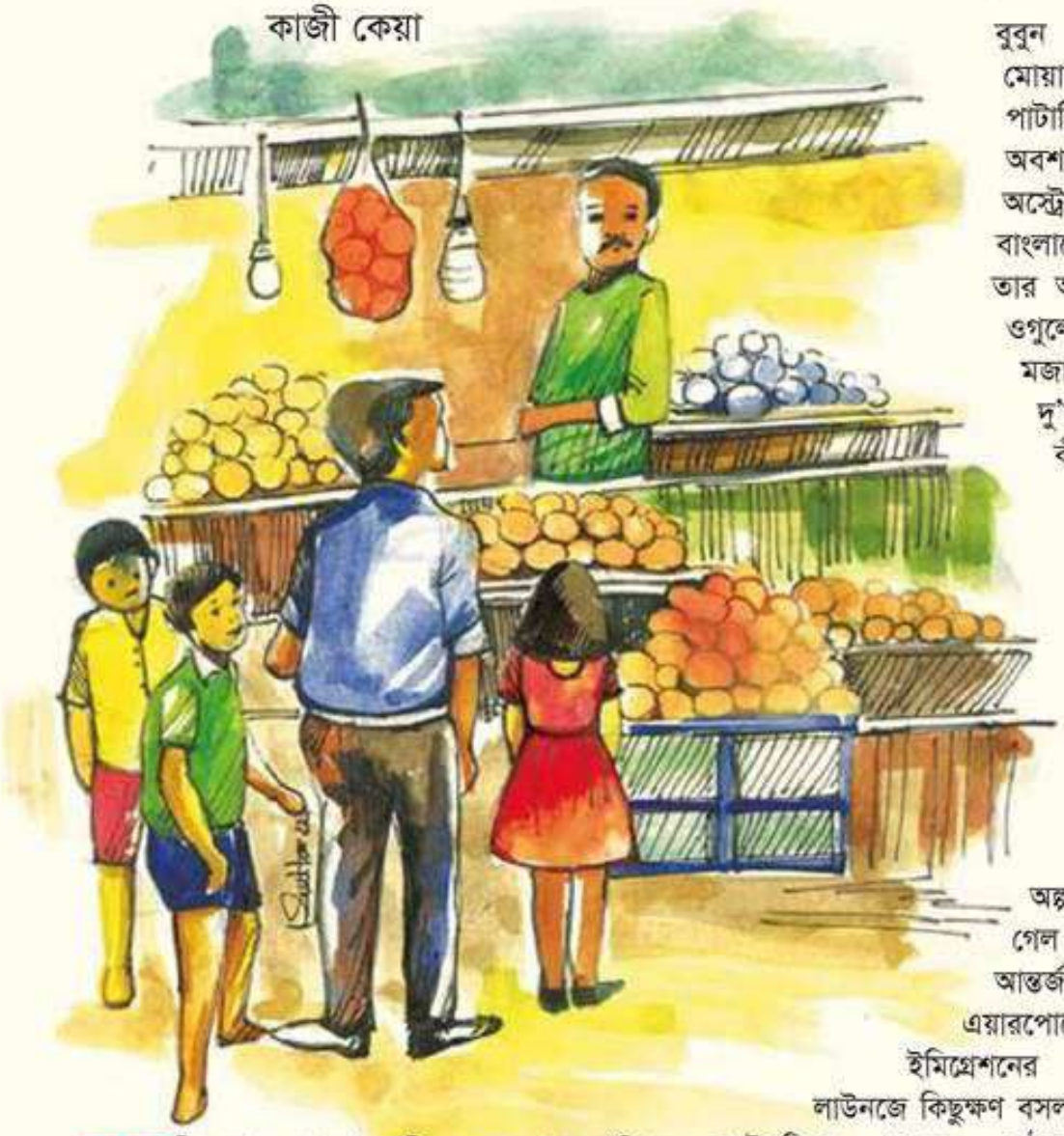

জনি আর রায়না কদিন ধরে খুব খুশিতে আছে।ওরা দূর অস্ট্রেলিয়া বেড়াতে যাবে। গত বছরই যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আব্বুর অফিসে বিশেষ কাজ ছিল বলে সম্ভব হয়নি।

মেজো খালা অস্ট্রেলিয়ায় থাকে। বার বার ফোন করে সেখানে কিছুদিনের জন্য বেড়িয়ে আসতে বলেন। এবার ঈদে জনি ও রায়নার স্কুলের লম্বা ছুটি। আব্বুও ছুটি নিয়েছেন। পাসপোর্ট ভিসা সব রেডি। মেজো খালার একমাত্র মেয়ে বুবুন। রায়নার বয়সি। সেও মিষ্টি মিষ্টি কণ্ঠে ফোনে কথা বলে রায়নায় সঙ্গে। বলে, 'রায়না আপু তুমি আসলে খুব মজা হবে।'

বুবুন তেঁতুলের আচার, মোয়া আর খেজুরের পাটালি খেতে চেয়েছে। অবশ্য ওর জন্ম অস্ট্রেলিয়াতে। এ পর্যন্ত বাংলাদেশে আসেনি। তবে তার আম্মুর কাছে শুনেছে ওগুলো খেতে দারুণ মজা। রায়না ও জনি দু'জনেই বুবুনের জন্য কী কী নিতে হবে তার একটা ফর্দ করে দিল আব্বুর হাতে। আব্বু ওগুলো কিনে আনলেন।

শুক্রবার ছুটির দিন। পথে তেমন যানজট নেই। ওরা বাসা থেকে রওনা দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে পৌঁছে গেল হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। এয়ারপোর্টে কাস্টমস-ইমিগ্রেশনের ঝামেলা শেষে লাউনজে কিছুক্ষণ বসল ওরা। সেখানে ওরা আইসক্রিম খেলো। হঠাৎ ঘোষণা দিল– অস্ট্রেলিয়াগামী ফ্লাইট আর কিছুক্ষণের মধ্যে ছেড়ে যাবে। যাত্রীরা যেন ৩নং গেইট দিয়ে অনতিবিলম্বে এগিয়ে যান। আব্বু, আম্মু ওদের দুজনের হাত ধরে এগিয়ে গেলেন। সঙ্গের লাগেজ আগেই এয়ারপোর্টের লোকজন নিয়ে গেছে। ডান-বামে দুটো করে ৪টা সিট। রায়না আব্বুর কাছে আর জনি আম্মুর কাছে বসল। দুজনেই জানালার কাছে বসেছে। প্লেন স্টার্ট দিয়ে অনেকক্ষণ চাকায় ভর করে এগিয়ে আস্তে আস্তে ওপরে উঠতে লাগল। ওরা জানালা দিয়ে সব দেখতে পাচ্ছে। ওরা তন্ময় হয়ে দেখে আর পুলকিত হয়।

জীবনে প্রথম প্লেনে চড়ার আনন্দে ওরা আবেগে আপ্লুত। প্লেন যত উপরে উঠছে নিচের সবকিছু ছোটো হতে হতে এক সময় অদৃশ্য হয়ে যেতে থাকে। এখন চারদিক কেমন নীল। যেন আকাশের কাছাকাছি ওরা, মেঘের গা ঘেঁষে চলছে। ব্যাংকক এয়াপোর্টে ফ্লাইট কয়েক ঘণ্টার জন্য থেমেছিল। ওরা নেমে লাউঞ্জে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে, ফাস্টফুড আর পানি খেয়ে আবার প্লেনের সিটে বসে পড়ে। এরপর আরো যে কত ঘণ্টা অতিক্রম করে অস্ট্রেলিয়ার সিডনি এয়াপোর্টে ওদের ফ্লাইট ল্যান্ড করল তা রায়না, জনি টের পেলো না। মেজো খালা আর খালাতো বোন ছোট্ট বুবুন ওদের রিসিভ করতে আসে। গাড়িতে করে খালার বাসায় পৌছানোর পর ওদের ঘুম ভাঙে। ওরা চোখ মেলে দেখে খালামনি, আম্মু, আব্বু, খালু আর ছোট্ট একটা মেয়ে। নিশ্চয়ই সে বুবুন।

বুবুন পাশের সোফায় বসেছিল। রায়নার ঘুম ভাঙতেই সে ছুটে এসে ওর হাত ধরে বলল, 'তুমি রায়না আপু না!'

রায়না হাসল। বলল, 'তুমি তো বুবুন তাই না! আর ওটা আমার ভাইয়া জনি।'

জনি বলল, 'বুবুন আপু তোমার জন্য না অনেক মজার মজার খাবার এনেছি।'

'তাই! আচার এনেছ? মোয়া এনেছ?'

'হ্যাঁ সব এনেছি।'

ওরা শপিংব্যাগে রাখা প্যাকেটগুলো বের করে দিল। খুব খুশি বুবুন।

মেজো খালা ওদেরকে কাছে টেনে নিয়ে আদর করতে লাগলেন।

সারা পথের ক্লান্তি ওদের চোখেমুখে। কেমন একটা ঘোর ঘোর ভাব। রাতে শুধু জুস খেয়ে ওরা ঘুমিয়ে পড়ল।

বেশ মজায় আছে ওরা। বুবুনের স্কুল কাছেই। বুবুন ওদের স্কুল দেখাতে নিয়ে যায়। ওর ক্লাসের বন্ধুরা ওকে পেয়ে খুব খুশি। তবে ওরা সবাই ইংরেজিতে কথা বলে।

ওদের দেখেই বুবুনের বন্ধুরা গুড মর্নিং বলে সম্ভাষণ জানালো। জনি, রায়নাও ইংরেজি জানে। তবে ওদের মতো নয়। বুবুন সঙ্গে করে কিছু আচার, মোয়া, নারকেলের নাড়ু নিয়েছিল। ওর প্রিয় বন্ধু মারীয়া, এলিজা এবং সেরেনা। ওরা তো বাংলাদেশের মজার খাবার পেয়ে দারুণ খুশি। বুবুন সারাপভ ম্যামের সঙ্গেও ওদের পরিচয় করিয়ে দিল। তিনি ওদের আদর করলেন এবং টফি উপহার দিলেন।

রোববার বুবুনের ছুটির দিন। তার আব্বুর অফিসও ছুটি। ঠিক হলো ওরা সবাই সিডনি থেকে প্রায় পঞ্চাশ কি.মি. দূরে সাফারি পার্ক দেখতে যাবে। খুব সকাল সকাল ওরা রেডি হয়ে নিল। বড়ো ল্যান্ড রোভার গাড়ি। আব্বু, আম্মু, মেজো খালা, খালু, বুবুন আর ওরা দুজন। রায়না বাংলাদেশের পতাকা আঁকা টি-শার্ট আর ক্যাপটা পরে নিল। ওর প্রিয় খাবার কলা। বাংলাদেশ থেকে আনা একছড়ি কলাও সে সঙ্গে নিল। ওরা শহর পেরিয়ে এগিয়ে যায়। গাড়ি চলছে দুপাশে অবারিত সবুজ মাঠের মধ্যে দিয়ে সরু পাকা রাস্তা ধরে। যেতে যেতে একটা খামারবাড়ির কাছে থামল।

খালুকে দেখে খামারের লোকজন ছুটে এল। সবাই গুড মর্নিং বলে সম্ভাষণ জানালো। বুবুনকে ওরা চেনে। তাকে পেয়ে আদর করল। জনি, রায়নাও আদর থেকে বঞ্চিত হলো না। খালু সবার সঙ্গে ওদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। এই খামারবাড়ি বুবুনদের। বেশ বড়ো। নানা ধরনের তরকারি, আপেল, স্ট্রবেরি ইত্যাদি ফলমূল ঝুড়ি ভরে ভরে সাজানো।

এই ফলগুলো শহরের বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টাল স্টোর ও ফলমূলের দোকানে চলে যায়। তারাই এসে কিনে নিয়ে যায়। বছর পাঁচেক আগে এই খামারটা খালু কিনেছেন।

এখানে ঘণ্টাখানিক বসে ফল খেয়ে, কফি খেয়ে তারপর আবার রওনা দিল ওরা। ওরা একবার কক্সবাজার সাফারি পার্কে এবং ঢাকা চিড়িয়াখানাতেও গিয়েছে– কিন্তু এত বিশাল সাফারিপার্ক এই প্রথম দেখল। ছবির মতো সাজানো। গাছপালা, বড়ো নদীর মতো ঝিল, পায়ে চলা পথ, জীবজন্তু আর পাখির জন্য যেন এক একটা রাজ্য। ওরা চারদিক ঘুরতে লাগল।

খালু বললেন, 'এই সাফারিপার্ক ঘুরে দেখতে গেলে কমপক্ষে ৭ দিন লাগবে।'

ওরা কুমির, জিরাফ, ক্যাঙ্গারু, বিচিত্র পাখি, লালমুখো বানর, ওরাং-ওটাং, উটপাখি, হাতি, বাঘ, সিংহ সবই দেখল। তবে সবচেয়ে ভালো লেগেছে জেব্রা আর জিরাফ।

ওরা সবাই একসঙ্গে ছিল। ঘুরতে ঘুরতে পার্কের ভেতরে এক অবসর ছাওনিতে গিয়ে বসল। সবাই এখানে একটু কিছু খেয়ে রেস্ট নিয়ে ডলফিন দেখতে যাবে। এরমধ্যে জনির চোখে ধরা পড়ল রায়না নেই।

'একি? রায়না কোথায় গেল?' আম্মুর মাথা বিগড়ে গেল। হায় হায় করতে লাগলেন তিনি। আব্বুও খুব ঘাবড়ে গেলেন। তবে মেজো খালা তার সেলফোনে কোথায় যেন ফোন করলেন। ফোন করার পর বললেন, 'সবাই একটু শান্ত হও। আমি পার্কের নিরাপত্তা কর্মকর্তার সঙ্গে কথা বলেছি। ওরা এখনই চারদিকে ঘোষণা করে দেবে এবং রায়নাকে খুঁজে বের করবে।' এর মধ্যেই হঠাৎ পার্কের পুব পাশে ওদের অবস্থান থেকে ১০০ গজ দূরে দর্শনার্থীর ভিড় জমে গেছে। সবাই হাততালি দিয়ে আনন্দে ফেটে পড়েছে। ব্যাপার কী?

রায়নার আম্মু, আব্বু, খালা সবাই সেদিকে ছুটতে থাকেন। পেছনে বুবুন, জনিও ছুটছে। গিয়ে তারা অবাক! রায়না খালি গায়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। তবে তাকে ঘাড়ে করে দাঁড়িয়ে আছেন এক অস্ট্রেলিয়ান ভদ্রলোক। 'এটা আমাদের মেয়ে!' রায়নার আম্মু লোকটার কাছে গিয়ে বলতেই লোকটা রায়নাকে নামিয়ে তার কোলে দিল। 'কী ব্যাপার তুমি খালি গায়ে কেন?' আম্মু বললেন।

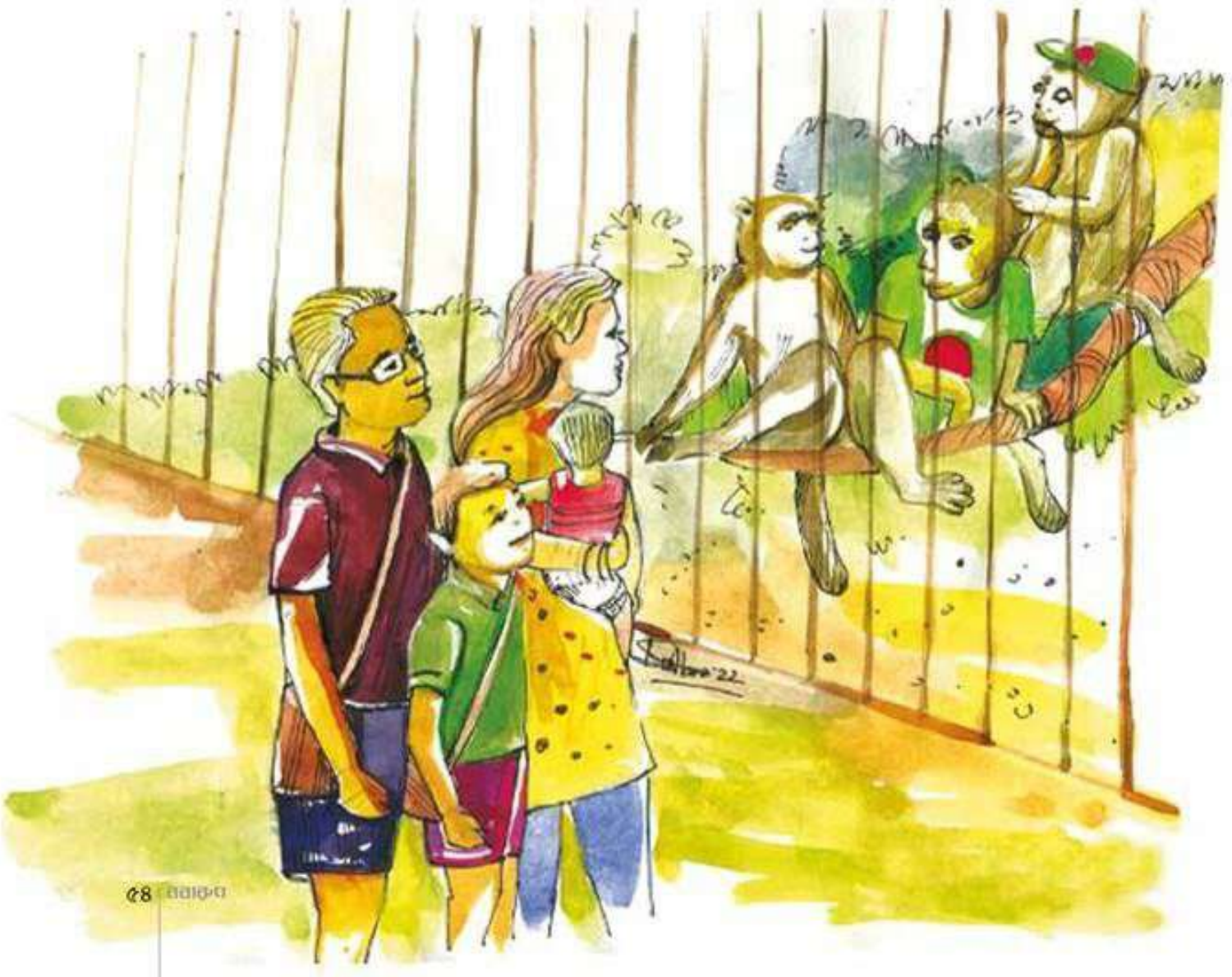

রায়না হাত দিয়ে দেখালো একটা গাছের দিকে। দুটো বানর। একজনের গায়ে বাংলাদেশের পতাকা আঁকা রায়নার টি-শার্টটা, আরেকজনের মাথায় বাংলাদেশের পতাকা আঁকা ওর ক্যাপটা। ওরা মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে কলা খাচ্ছে।

'কী করে হলো এমনটি?' আম্মু জিজ্ঞেস করলেন।

'আম্মু, আমি তোমাদের পেছন পেছন যাচ্ছিলাম। হঠাৎ মনে হলো আমার হাতের কলার শপিংব্যাগটা কে যেন টান দিল। পেছন ফিরতেই দেখি দুটো বানর। ওরা আমাকে টেনে মাটিতে বসিয়ে দিল। তারপর একজন আমার কলার ব্যাগ আর অন্য বানরটা আমার গা থেকে টি-শার্ট আর মাথা থেকে ক্যাপটা খুলে নিয়ে পালালো।' এই বলে রায়না অ্যাঁ অ্যাঁ করে কাঁদতে লাগল।

এর মধ্যে সাফারি পার্কের নিরাপত্তা কর্মকর্তা তার লোকজন নিয়ে হাজির।

তিনি মৃদু হেসে বললেন, 'তোমরা তো বাংলাদেশ থেকে এসেছ তাই না! ওই বানর দুটোও সম্প্রতি বাংলাদেশ থেকে আমরা এনেছি। ওদের নাম রেখেছি টুলটু আর গুলটু। খুব দুরন্ত ওরা। তবে নিজের দেশটাকে ওরা খুব চেনে। বিশেষ করে টুপি আর টি-শার্ট আঁকা বাংলাদেশের পতাকা দেখেই ওরা বুঝেছে তোমরা বাংলাদেশি। তাই তো ওরা ওর টি-শার্ট আর ক্যাপটা নিয়ে ভেগেছে। আর বাংলাদেশের কলাও ওরা চিনতে পেরেছে।'

তিনি আরো বললেন, 'ওরা এ দেশের কলা খেতে চায় না। সব ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। দেখো কেমন মজা করে ওরা দেশের কলা খাচ্ছে।'

নিরাপত্তা কর্মকর্তা বানর দুটোকে ইশারা করে ডাকলেন এবং ইশারায় বললেন, ক্যাপ আর জামাটা তোমরা মেয়েটাকে দিয়ে যাও।

বানররা কেমন মানুষের মতো ঘাঁড় নাড়িয়ে জনালো না না দেবো না। বানর দুটো এ ডাল থেকে ও ডালে যায়, আর আনন্দে মাথা দুলাতে থাকে।

টুপিওয়ালা বানরটা টুপিটা মাথা থেকে খুলে খুব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে। টি-শার্টওয়ালা বানরটাও টি-শার্টে বাংলাদেশের পতাকা আঁকা ছবিটা দেখছে আর রায়নার দিয়ে তাকিয়ে ফিকফিক করে হাসছে।

কী আর করা। অনেক বেলা হয়েছে। খালু বললেন, 'চলো ঘরে ফেরা যাক।'

ওরা ফিরতে ফিরতে ব্যাপারটা নিয়ে খুব হাসাহাসি করলেন।

মেজো খালা বললেন, 'হাজার হলেও বাংলাদেশের বানর। দেশের প্রতি ওর টানটা তো থাকবেই।'

খালু বললেন, 'আমি ওদের সালাম জানাই। ওদের কাছে আমাদের শিক্ষা নেওয়ার অনেক কিছু আছে। প্রিয় পতাকা দেখেই ওরা দেশকে চিনেছে, অথচ আমরা অনেকেই দেশের মধ্যে থেকেও দেশটাকে চিনতে পারি না। এজন্যই তো আমরা দেশটাকে ভালোবাসতে শিখিনি।'

অব্বু বললেন, 'ঠিক বলেছ। তবে আমার আর এক মুহূর্তও এখানে থাকতে ইচ্ছে করছে না। দেশ আমাকে টানছে। মনে হচ্ছে কতদিন আমি আমার দেশকে দেখিনি।'

খালা মৃদু হেসে বললেন, 'আপনার মধ্যে এটা হওয়া স্বাভাবিক। কারণ আপনি তো একজন বীর মুক্তিযোদ্ধা।'

আব্বু একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

জনি আব্বুর কাছে ঘেঁষে আসল। বলল, 'আব্বু আমারও না দেশের জন্য মন কাঁদছে।' আর রায়না তো কেঁদেই ফেলল, 'আমি দেশে যাব...।'

আম্মু বললেন, 'ভেবেছিলাম এক মাস বেড়াবো। অস্ট্রেলিয়া দেশটাকে একটু ঘুরে দেখব। কিন্তু বানর দুটোর দেশপ্রেম দেখার পর আমারও দেশের দিকে মন টানছে।'

আব্বু ঠিক করলেন পরশুর ফ্লাইটে দেশে ফিরবেন। সিদ্ধান্তটা জানাতেই রায়না আর জনি অব্বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'আব্বু তুমি খুব ভালো।' ■

শিশু সাহিত্যিক

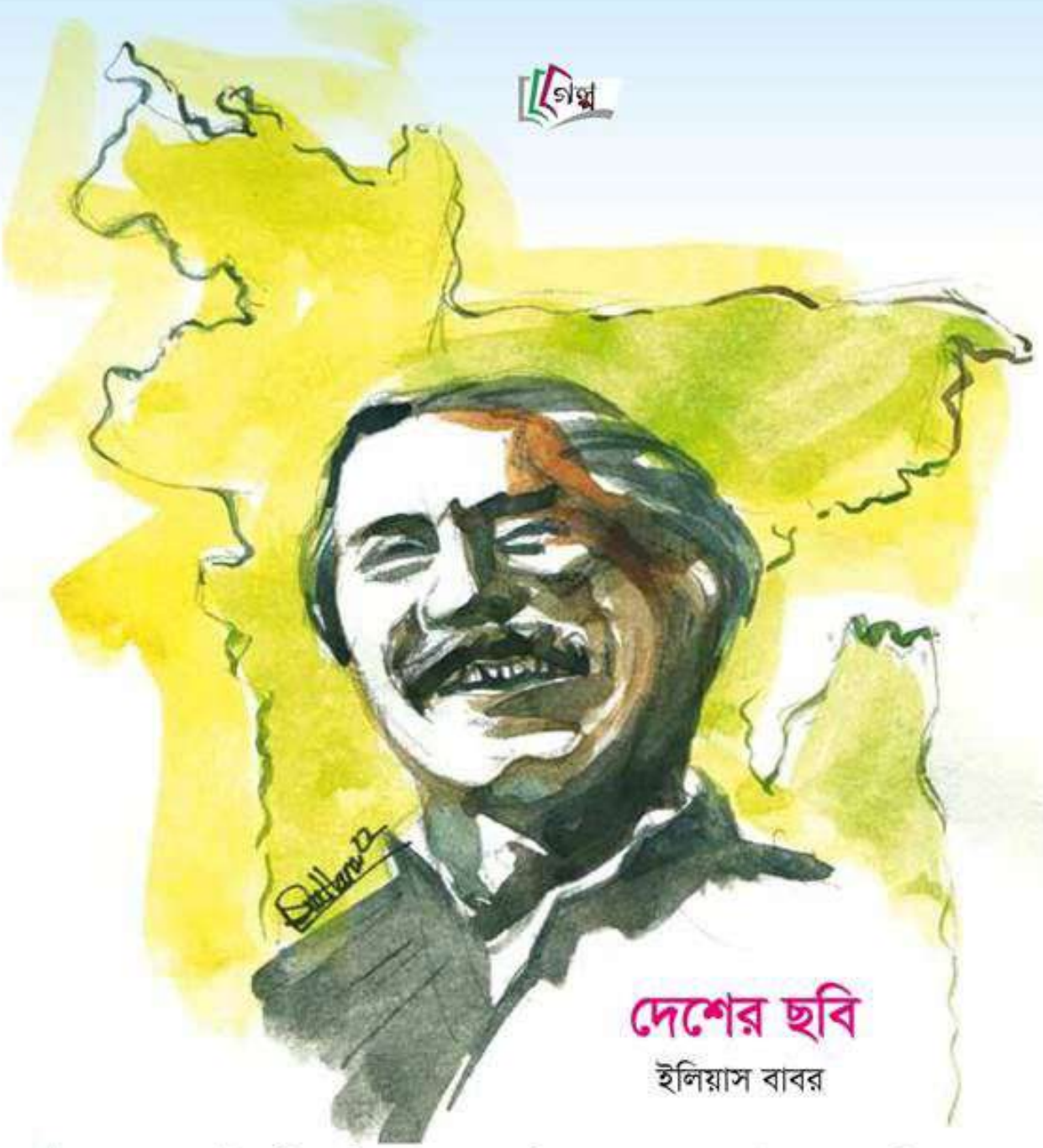

দেশের ছবি

ইলিয়াস বাবর

গতবার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান শেষে স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পর কেমন যেন বদলে যায় সিজাব। সবুজ-শান্ত চেহারায় অবুঝ-অশান্ত ভাব। প্রিয় বাইসাইকেলটিকে এক লাথি মেরে ফেলে দেয় গোয়াল ঘরে গোবরের ঢিবির পাশে।

অথচ অন্য সময় তার সাইকেলে ধুলো কি শুকনো পাতা পড়বে সে জো-ও নেই। সাফসুতরা করে রাখে দু'চাকার এ বাহনটি। ক্রিং ক্রিং বেল বাজিয়ে সিজাব যখন স্কুলের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে যায় মা মাথায় আঁচল টেনে দিয়ে চেয়ে থাকে ছেলের চলে যাওয়ার দিকে। সাইকেলের পেছনের সিটে রশি দিয়ে ব্যাগ বেঁধে নেয় সিজাব, ব্যাগের পকেটে থাকে পানির বোতল। ছেলের পথের দিকে তাকিয়ে মাজেদা বেগম একটু স্মৃতিকাতর হয়ে যান যেন-বা। তিন-তিনটা সন্তানের মৃত্যুর পর সিজাবের জন্ম। স্বামী প্রবাসে; মা বলতে মাজেদা বেগম, বাবা বললেও মাজেদা বেগম। অতি আদরে মানুষের ছেলেরা নাকি মাথায় ওঠে, শুনেছে মাজেদা বেগম– ছেলে তার মাথায় ওঠেনি। পড়াশোনা করে মন দিয়ে। মুরব্বিদেরও মান্য করে। সিক্স থেকে সেভেনে উঠেছে, রোল তিন। ইউনাইটেড হাই স্কুলের ক্লাস সেভেনের তিন সেকশনে শিক্ষার্থী সংখ্যা তিনশোর ঘর ক্রস করে আরো এক কুড়ি! ক্রমিক তিন মানে ছেলের মাথা ভালো।

সাইকেলকে গোয়াল ঘরে রেখে হনহন করে ঘরে ঢুকে সিজাব।

মাজেদা বেগমের চেহারায় রাজ্যের বিস্ময়, যেন-বা জলতোলা মাছের লাহান বেদিশা ছটফটানি শুরু হয়ে গেছে।

: কী হয়েছে বাবা? মা জিজ্ঞেস করে।
: কিচ্ছু না। সিজাবের উত্তর।
: আমার সিজাব না লক্ষ্মী। বলো বাবা কী হয়েছে?
: বললাম তো কিছু না।
: তাহলে মুখটা অমন বেজার কেন? সাইকেলেরই বা দোষ কী?
: যত সব ওই বজ্জাত সাইকেলটা... কথা আর বের হয় না সিজাবের মুখ দিয়ে। বানের জলের মতো কান্না আর ফোঁসানি। মাজেদা বেগম ছেলের আচমকা কান্না দেখে অবাক। তার ছেলে কাঁদুনে নয়, যখন-তখন আবদারও করে না কোনো কিছুর। আজ হলোটা কী? সকালে স্কুলে যাওয়ার সময় বলে গেছে, মা, আজ স্কুলে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান। দেখবা আমিও একটা পুরস্কার নিয়ে আসব! ছেলের এমন কথায় মাজেদা বেগমের চোখ গর্বে ছলছল করে। সোনার টুকরো ছেলে কজনের পেটে ধরে! নতুন জামা পরে, সিঁথি কেটে সিজাব বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় পা ছুঁয়ে সালাম করে মাথায় নেয় মায়ের পদধূলি। ক্রিং ক্রিং করে চাঁদমুখের হাসি নিয়ে বের হওয়া সিজাবের কান্না দেখে মায়ের মনে দানা বাধে নানান জল্পনা। কত দিকে কত কিছু ঘটে আজকাল! কেউ কী কিছু বলেছে সিজাবকে? স্কুলের অনুষ্ঠানে কি অপ্রীতিকর কিছু ঘটেছে? ইদানীং যে-কোনো অনুষ্ঠানেই ছোকরাদের উৎপাত। আচ্ছা, পুরস্কার কি পায়নি সিজাব? মাথায়-মুখে হাত বুলিয়ে ছেলেকে শান্ত করার চেষ্টা করে মাজেদা বেগম। ফ্রিজ থেকে তাজা ফল বের করে দেয়। ছেলের কোমল চেহারায় তখনো ঝড়ের চিহ্ন। আদুরে গলায় মাজেদা বেগম জিজ্ঞেস করে–

: বাবা, ফলটা দারুণ স্বাদের না?
: হুঁ।
: পুরোটা খেয়ে নাও বাবা।
: হুঁ। কথা বলার ফন্দি, না?
: আমার ছেলে তো পচা না, সব বলে মাকে।
: বলি বলেই তো ছাড়ো না!
: আচ্ছা বলো তো, আজ কী হয়েছে?
: কিচ্ছু না।
: তুমি এখন সেভেনে পড়ো। যে-কোনো বিষয়ে এমন করলে চলে?
: তো কী করব?

: সাইকেলটা গোয়াল ঘরে গোবরের টালে রেখে আসলে কেন? প্রিয় জিনিসকে কেউ এমন করে?

: ওটাই যত নষ্টের মূল।
: সাইকেলের কি হাত-পা আছে যে তোমার ক্ষতি করবে?
: ওটা আর নেব না স্কুলে। পায়ে হেঁটে যাব, গাড়িতে যাব, তবুও না।
: সাইকেলটা তোমার কত সময় বাঁচায় জানো? ইচ্ছে হলেই সাঁ করে চলে যেত পারো যে-কোনো প্রয়োজনে।
: তোমাকে বলছিলাম না আজ পুরস্কার পাব, উপস্থিত বক্তৃতায় প্রথম পুরস্কার পেয়েছি আমি!
: তা তো ভালো কথা। কান্নার কী আছে?
: কিন্তু...
: কিন্তু কী
: বাড়ির সীমানায় এসে দেখি, পুরস্কারটা আর নেই!
: কেন?
: ওই কুফা সাইকেলটার পেছনের সিটে রশি দিয়ে আটকে নিয়েছিলাম। এখানে এসে দেখি পুরস্কারটা নেই! আবারো ফোঁসানি সিজাবের।

: পুরস্কার তো পেলেই, সবাই জেনেছে, তুমি পুরস্কার পেয়েছ। বাড়ি আনতে পারোনি তাতে কোনো সমস্যা নেই। সামনেরবার ঠিকভাবে আনলেই হয়!
: বললেই হলো! রাস্তায় এত গাড়ি চলে, কোথায় পড়েছে কে জানে– একটু শব্দও হলো না জিনিসটা যে পড়ে গেল!
: তা পুরস্কারটা কী ছিল বাবা?
: বাঁধাই করা একটা ছবি।
: একটা ছবির জন্য এত কান্না?
: মা, ওটা শুধু ছবি না, বঙ্গবন্ধুর ছবি!
হঠাৎ-ই নীরবতা নেমে আসে মা-ছেলের কথায়। ঝিম

ধরে অনেকক্ষণ বসে থাকার পর মাজেদা বেগম চলে যান রান্নাঘরে। সিজাব পড়ার ঘরে।

২.

বছর শেষে ফিরে আসে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার মাস। মায়ের পীড়াপীড়িতে এবারো সিজাব হাসান নাম দেয় প্রতিযোগিতায়। উপস্থিত বক্তৃতায় সিজাবের নাম না দেখে স্যারেরা অবাক, ইভেন্ট বদল করে সিজাব এবার নাম দিয়েছে চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতায়। মাজেদা বেগম জানেন, ছেলে তার একগুঁয়ে তবে নিজের বিশ্বাসে বলিয়ান।

বাসায় প্রতিদিন নিয়ম করে ছবি আঁকার প্র্যাকটিস করে যায় সিজাব। সাদা কাগজের বুকে জলরঙে দেশের ছবি আঁকতে থাকে নানান এঙ্গেলে। না, মনঃপূত হয় না সিজাবের। একবার আঁকে তো, ছিঁড়ে ফেলে দেয়। ছাপ্পান্ন হাজার বর্গমাইলের চেনা ভূগোলকটা কেমন মনমরা তার হাতে। কেমন নির্জীব, কথা বলে না কাগজের বুকে। বেশ কয়েকটা জলরঙের ছবি এঁকেও সন্তুষ্ট হতে পারে না সে। নিজের কাছে যে ছবি পায় না পূর্ণ নম্বর, তা স্যারের কাছে, প্রতিযোগীতায় তো চুনোপুঁটি! মাকে ডাকে, মা, মা, এদিকে এসো তো... ছেলের ছবি আঁকার কাণ্ড দেখে মাজেদা বেগম হেসে খুন। বলো তো, কীভাবে আঁকলে দেশের সবচেয়ে সুন্দর ছবি আঁকা যাবে? প্রথম পুরস্কার পাব? খানিক দম নিয়ে মাজেদা বেগম বিজ্ঞ বিচারকের মতো রায় দেয়– তোমার ছবি শুধু পুরস্কার পেলেই হবে না, হতে হবে শ্রেষ্ঠতম ছবি। যে ছবির জন্য গত বছর চোখের জল ছেড়েছ, যে ছবির জন্য জেদ চেপেছ মনে, সেই মহানায়কের ছবি ছাড়া কখনোই পূর্ণতা পাবে না দেশের ছবি। বাংলাদেশের ছবি আঁকতে হলে, তাঁকে ভেতরে ধারণ করতে হবে, তাঁর ছবি থাকতে হবে তাতে। একটানে কথাগুলো বলে রান্নাঘরের দিকে বেরিয়ে যায় মাজেদা বেগম। সিজাব মনোযোগ দেয় ছবি আঁকায়। হাতের নিপুণ কারুকাজে জলরং যেন দেববৃষ্টি, সিজাব স্পষ্ট দেখতে পায়, তার আঁকার সাদা কাগজ ভরে গেছে অন্যরকম উজ্জ্বলতায়। বাংলাদেশের মানচিত্রের মাঝে হাসছেন মহানায়ক। জানালায় ভেসে আসা জোছনার আলো সিজাবকে কানে কানে শুনিয়ে দেয়, বাংলাদেশ মানে বঙ্গবন্ধু, বঙ্গবন্ধু মানেই বাংলাদেশ! ■

শিশু সাহিত্যিক

স্বাধীনতা

ড. নলিনী রঞ্জন বসাক

হে মোর স্বাধীনতা
তুমি কঙ্কালের স্তূপ থেকে
বেরিয়ে আসা একটা গভীর আর্তনাদ !
তুমি নিপীড়িত রমণীর শাড়ির আঁচল
তুমি ছেলে হারা মায়ের বুকফাটা ক্রন্দন
আমার খোকা !
বিদ্রোহী জনতার মিছিল চলে রাজপথ ধরে
তুমি তাদের মুখের একটি স্লোগান-
জয় বাংলা!!

৮ই মার্চ এবং আমাদের অর্জন | হাছিনা আক্তার

প্রতি বছর ৮ই মার্চ নারীদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা জানানোর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করা হয়। এই দিবস পালনের মূল লক্ষ্য সমাজের সব স্তরে নারীর অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা। বর্তমান সময়ে নারীরা সমাজের সব স্তরেই সাফল্য অর্জন করছে। নারী দিবস -২০২২ -এর প্রতিপাদ্য 'নারীর সুস্বাস্থ্য ও জাগরণ' নির্ধারণ করা হয়েছে।

১৮৫৭ সালের ৮ই মার্চ নিউইয়র্ক শহরের একটি পোশাক কারখানায় নারী পোশাক শ্রমিকেরা ন্যায্য মজুরি ও শ্রমের দাবিতে আন্দোলন করেন। আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল পুরুষের সমান মজুরি এবং দৈনিক ৮ ঘণ্টা শ্রমের দাবি। এই আন্দোলনে পুলিশ নির্যাতন চালায় এবং অনেককে গ্রেফতার করে।

১৯০৮ সালের একই দিনে নিউইয়র্কে পোশাক শ্রমিক ইউনিয়নের নারীরা আরেকটি প্রতিবাদ সমাবেশ করেন। ১৪ দিন ধরে এই প্রতিবাদ চলে এবং এতে প্রায় ২০ হাজার নারী শ্রমিক অংশগ্রহণ করেন। কর্মক্ষেত্রে অতিরিক্ত শ্রম এবং শিশুশ্রম বন্ধের দাবিতে তারা এ আন্দোলন করেন। কর্মক্ষেত্রে এই আন্দোলন নারীদের ঐক্যবদ্ধতার একটি বড়ো উদাহরণ। ১৯১০ সালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক সম্মেলনে জার্মান সমাজতান্ত্রিক ক্লারা জেটকিন নারীর ভোটাধিকার এবং একটি নারী দিবস ঘোষণার দাবি জানান। ১৯১৩ সালে রাশিয়ার নারীরা ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ রোববার নারী দিবস হিসেবে পালন করেন। বাংলাদেশের উন্নয়নে নারীর ভূমিকা ও অবদান অনেক বেশি। দেশের সর্বত্র নারীর গুরুত্ব আজ স্বীকৃত। অতীতের যে-কোনো সময়ের তুলনায় বাংলাদেশে নারীর ক্ষমতায়ন অনেকটাই বেড়েছে। সার্বিক উন্নয়নে বাংলাদেশের যে বিস্ময়কর উত্থান, তার নেপথ্যে নারীর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন বাঙালি নারীদের ক্ষমতায়নের পথিকৃৎ। ১৯৬৭ সালে মহিলা লীগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু নারীদের মূলধারার রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টি করে দেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্র ও গণ-জীবনের সব পর্যায়ে নারীদের সম-অধিকারের নিশ্চয়তা দেওয়া হয় এবং নারী ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে রাষ্ট্রের বিশেষ বিধান প্রণয়নের ক্ষমতাও

সংযোজন করা হয় (অনুচ্ছেদ ২৭ ও ২৮)। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আদর্শ অনুসরণ করেই বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ক্ষমতায় আসার পরপরই সব পর্যায়ে লিঙ্গ সমতা, নারীর উন্নয়ন এবং ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করার জন্য অসংখ্য নীতিমালা ও আইন প্রণয়ন করেন এবং বাস্তবিক অর্থে সব পর্যায়ে তা সুসংহত ও কার্যকর করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করছেন।

শিক্ষায় নারীদের শতভাগ অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা, নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করা, আইন প্রণয়নের মাধ্যমে নারীদের সুরক্ষা ও অধিকার নিশ্চিত করা এবং রাজনীতিতে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার জন্য শেখ হাসিনার গৃহীত উদ্যোগ ও সাফল্য অভাবনীয়।

বর্তমান সরকার জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি-২০১১ অনুসরণে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে নারীর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতায়ন, জেন্ডার বৈষম্য দূরীকরণ ও শিশুর অধিকার প্রতিষ্ঠা করে তাদেরকে সামগ্রিক উন্নয়নের মূল স্রোতোধারায় সম্পৃক্ত করতে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। নারীর মানবিক সক্ষমতা, অর্থনৈতিক অংশগ্রহণ ও সুবিধা বৃদ্ধি, নারীর কণ্ঠস্বর ও প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তাদের জন্য অবকাঠামো ও যোগাযোগ পরিষেবা বৃদ্ধি ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জোরদার করা হচ্ছে।

২০২১-২০২২ সালের অর্থবছরে জাতীয় বাজেটের প্রায় ৩০ শতাংশ নারী উন্নয়নে বরাদ্দ দেওয়া হয়। বর্তমানে প্রাথমিক পর্যায়ে নারী শিক্ষার্থীর হার ৯৯.৪ শতাংশ। সরকার বিনামূল্যে ৬-১০ বছর বয়সি সব শিশুকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে এবং সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত বিনামূল্যে মেয়েরা পড়াশোনা করতে পারছে। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয় এবং স্কুলে যেতে উৎসাহিত করতে মেয়েদের দেওয়া হয় বৃত্তি। সম্প্রতি সরকার ঘোষণা দিয়েছে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বিনামূল্যে খাবার বিতরণ এবং শিক্ষার্থীদের পোশাক তৈরির জন্য এককালীন টাকা দেওয়া হবে।

নারীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে কোনোও জামানত ছাড়াই সর্বোচ্চ ২৫ লাখ টাকা এসএমই ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আবার নারী উদ্যোক্তারা বাংলাদেশ ব্যাংক ও এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক থেকে ১০ শতাংশ সুদে ঋণও নিতে পারছেন। বর্তমানে ৩০ লাখেরও বেশি নারী শ্রমিক পোশাক শিল্পে কর্মরত আছেন। সরকারের সপ্তম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০১৬-২০২০) অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতের অঙ্গীকার করা হয়েছে।

এছাড়া ব্যবসায়ে সমান সুযোগ তৈরি করার উদ্দেশ্যে ২০১১ সালে জাতীয় নারী নীতি গ্রহণ করা হয়। দুস্থ, অসহায় ও পিছিয়ে পড়া নারীদের জন্য বর্তমান সরকারের বহুমুখী প্রকল্প চালু আছে; এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ভিজিএফ, ভিজিডি, দুস্থ ভাতা, মাতৃত্বকালীন ও গর্ভবতী মায়েদের ভাতা, অক্ষম মা ও তালাকপ্রাপ্তদের জন্য ভাতা, কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচি, আমার বাড়ি-আমার খামার ইত্যাদি। এছাড়া কর্মজীবনে নারীদের অংশগ্রহণকে সহজ করার লক্ষ্যে মাতৃত্বকালীন ছুটি ৪ মাস থেকে ৬ মাসে উন্নীত করা হয়েছে। প্রান্তিক নারীদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়ার জন্য খোলা হয়েছে গ্রামভিত্তিক কমিউনিটি ক্লিনিক; মাতৃস্বাস্থ্য ভাউচার স্কিমের আওতায় গর্ভধারণ থেকে প্রসবকালীন সব খরচ, এমনকি যাতায়াত খরচও এখন সরকার বহন করে। যার ফলে অনেক কমেছে মাতৃত্বকালীন মৃত্যুহার।

এছাড়া সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, সেনা, নৌ, পুলিশ, বিজিবি, সাহিত্য, শিল্পসহ সর্বোচ্চ বিচারিক কাজেও নারীদের অংশগ্রহণ ও সাফল্য এখন লক্ষণীয়। আমাদের নারীরা খেলাধুলায়ও পিছিয়ে নেই। প্রথম নারী উপাচার্য, প্রথম নারী পর্বতারোহী, প্রথম বিজিএমইএ নারী সভাপতি, প্রথম সংখ্যালঘু নারী মেজর, প্রথম নারী স্পিকার, প্রথম নারী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিগত এক দশকেই সৃষ্টি হয়েছে। বলাবাহুল্য, নারীদের এই অভূতপূর্ব ক্ষমতায়নে অংশগ্রহণের সুযোগ ও অনুপ্রেরণার যিনি প্রথম ভাগীদার, তিনি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

ভাষা আন্দোলন ও মহান মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে সব আন্দোলন, সংগ্রাম ও দেশ গঠনে আমাদের নারীদের বিশাল ভূমিকা রয়েছে। তাই রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণকে সুসংহত করার জন্য জাতীয় সংসদে নারী আসনের সংখ্যা আরও পাঁচটি বাড়িয়ে ৫০টিতে উন্নীত করা হয়েছে। স্থানীয় পর্যায়ে অনেক নারীকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে। ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনেও প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে ১২ হাজারের বেশি নারী জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়েছে। বর্তমান সংসদে নারী সদস্য আছেন ৭২ জন এবং বিরোধী দলীয় নেত্রী, স্পিকার, শিক্ষামন্ত্রীসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে নারীদের আসীন করা হয়েছে এবং তারা দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন।

নারীর প্রতি সব ধরনের সহিসংতা রোধে ২০১২ সালে প্রণয়ন করা হয় পারিবারিক সহিংসতা দমন ও নিরাপত্তা আইন- ২০১২। নারীদের সুরক্ষা নিশ্চিতে প্রণয়ন করা হয় মানবপাচার প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণ আইন- ২০১২, পর্নোগ্রাফি নিয়ন্ত্রণ আইন- ২০১১। বাল্যবিবাহ নিরোধ করে মেয়ে শিশুদের সমাজে অগ্রগামী করার জন্য বাল্যবিয়ে নিরোধ আইন- ২০১৭ প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া মেয়ে শিশুদের নিরাপত্তায় শিশু আইন- ২০১৩ প্রণীত হয়েছে। হিন্দু নারীদের অধিকার ও মর্যাদা রক্ষার্থে হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন- ২০১২ প্রণয়ন করা হয়েছে। নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে সরকার জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে এবং ৭টি বিভাগে One stop crisis center খোলা হয়েছে।

নারী-পুরুষের সমতা অনুধাবনের অন্যতম মাপকাঠি হচ্ছে রাজনৈতিক ক্ষমতায় নারী-পুরুষের আনুপাতিক অবস্থান। রাজনৈতিক ক্ষমতায়নে নারীর অংশগ্রহণের বিষয় বিবেচনায় বাংলাদেশের অবস্থান বিশ্বে অষ্টম। আবার ১৩৬টি দেশের মধ্যে লিঙ্গ বৈষম্য নিরসনে বাংলাদেশের অবস্থান ৭৫তম, যা গত ১০ বছরে এগিয়েছে ১১ ধাপ (Global Gender Group Report 2013, World Economic Forum)। নারীরা তাদের মেধা, শ্রম, সাহসিকতা, শিক্ষা ও নেতৃত্ব দিয়ে আমাদের দেশ গঠনে কাজ করে যাচ্ছেন এবং একই সঙ্গে ভূমিকা রাখছেন একটি স্বাবলম্বী শিক্ষিত প্রজন্ম গঠনে। নানা অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে যে অভাবনীয় আর্থিক সমৃদ্ধি, উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জন সম্ভব হয়েছে, তা মূলত নারীর ক্ষমতায়ন ও অগ্রগতির জন্যই, আর এক্ষেত্রে যার অবদান অনস্বীকার্য, তিনি রাষ্ট্রনায়ক শেখ হাসিনা। নারী উন্নয়ন ও ক্ষমতায়নে তাঁর অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি গ্লোবাল উইমেন্স লিডারশিপ, প্ল্যানেট ফিফটি ফিফটি চ্যাম্পিয়ন, এজেন্ট অব চেঞ্জসহ নানাবিধ সম্মাননা অর্জন করেছেন। তাঁর সব অর্জন বাংলাদেশের নারীদের যেমন গর্বিত করে, তেমনি আশার আলো দেখায় পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে বৈষম্যহীন-সম্মানজনক অবস্থানে উন্নীত হয়ে সর্বস্তরে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে। ■

সিনিয়র সম্পাদক, সচিত্র বাংলাদেশ ও নবারুণ

স্বাধীনতা কথা

জান্নাতুল নাঈম

আজ ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবস। লাশের ধ্বংসস্তূপ থেকে রক্তরাঙা সূর্যের পূর্বাভাষের দিন আজ। সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হওয়ায় এটি আমাদের জাতীয় দিবসও বটে। ৩০ লাখ শহিদের আত্মাবলিদান আর লক্ষ মা-বোনের সম্ভ্রমের বিনিময়ে আমরা পেয়েছি লাল-সবুজের পতাকা। যুদ্ধদিনের নানান ঘটনা পরম্পরা আর আজকের বাংলাদেশের প্রত্যাশার কথাই জানাচ্ছি। আজ তার সুবর্ণজয়ন্তী।

একাত্তরের ২৬শে মার্চ সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধে নেমেছিলেন লক্ষ বাঙালি। এরই ধারাবাহিকতায় নয় মাসের রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর ১৬ই ডিসেম্বর অর্জিত হয়েছিল স্বাধীনতা। বাঙালি জাতি পেয়েছিল একটি স্বাধীন দেশ একটি পতাকা আর জাতীয় সংগীত।

রক্তের অক্ষরে বিশ্ব ভূ-খণ্ডের বুকে লেখা হয়েছিল একটি নাম বাংলাদেশ। ২৫শে মার্চ মধ্যরাতে পাকিস্তানি বাহিনী যে নির্মম হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছিল তা স্পষ্ট হয়েছিল ২৬শে মার্চ। শুধু ঢাকাতেই নয় যশোর, চট্টগ্রাম সেনানিবাসসহ অন্যান্য স্থানেও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছিল বর্বর পাকবাহিনী। তারপর, যুদ্ধ ক্রমশ ছড়িয়ে পড়েছিল শহর থেকে প্রত্যন্ত এলাকায়।

৭ই মার্চ বঙ্গবন্ধুর ভাষণ আর তাঁকে গ্রেফতারের আগমুহূর্ত পর্যন্ত দেয়া নানামূখী ঘোষণাই ছিল মুক্তিকামী বাঙালির বীরত্বগাথার অমর আখ্যান। কারাগারে যাবার আগে যার যতটুকু প্রয়োজন সেই বার্তাই রেখে যান বাংলার মুকুটহীন সম্রাট শেখ মুজিবুর রহমান।

বঙ্গবন্ধু ছিলেন বিশাল হৃদয়ের এক মহান মানুষ। সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ তিনি সব সময় ঘৃণা করতেন। মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তিনি বলেছেন, 'আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা'।

এই দেশকে তিনি বড্ড ভালোবাসতেন এবং আমরাও আমাদের দেশকে ভীষণ ভালোবাসি। আমরা বঙ্গবন্ধুর মতো দেশকে ভালোবাসবো। উদার ও অসাম্প্রদায়িক চেতনায় বেড়ে উঠব। স্বাধীনতার শত্রুদের সমস্ত ষড়যন্ত্র রুখে দিয়ে আমরা এ দেশকে গড়ে তুলব। এবারের ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবসে এই হোক আমাদের দৃপ্ত শপথ। ■

দশম শ্রেণি, এইচ, এইচ, বি রেসিডেন্সিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ সাভার, ঢাকা

অমর তাঁরা

তাছমিনা রহমান পূর্ণ

স্বাধীনতা পেয়েছি মোরা
লাখো প্রাণের বিনিময়ে
অমর হয়ে থাকবে তাঁরা
আমাদের সবার হৃদয়ে।

লাল-সবুজের পতাকা পেতে
রয়েছে তাঁর অসীম অবদান
তিনি হলেন সবার প্রিয়
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

৭ম শ্রেণি, মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

বীর

মিনহাজুল ইসলাম

দেশকে ভালোবেসে
দিল যারা প্রাণ
ভুলে যেতে পারব না
তাদের অসীম অবদান।

তারা আমাদের শ্রেষ্ঠ সন্তান
জানাই হাজার সালাম
তাদের আত্মদানে
সোনার দেশটি পেলাম।

৯ম শ্রেণি, পলিটেকনিক স্কুল, চাঁদপুর

বীরত্ব

মিহির হুসাইন

সাতই মার্চে বঙ্গবন্ধুর
হৃদয় কাঁপানো অমর কথা
অস্ত্র হাতে বীর বাঙালি
ছিনিয়ে আনে প্রিয় স্বাধীনতা।

প্রাণপণ যুদ্ধ করে
বিজয় আনে ১৬ই ডিসেম্বর
তাঁরাই আমাদের সূর্য সন্তান
করব স্মরণ জীবন ভর।

৬ষ্ঠ শ্রেণি, মনিপুর উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা

আমার বাড়ি

রোমানা নাসের

আঁকাবাঁকা নদী, মাঝিদের গান
উদাসী বাতাস, পালতোলা নৌকা
পাখির কলতান, মেঠোপথ,
শস্যশ্যামল ফসল, গাছের সারি
এমন সোনার দেশে আমার বাড়ি
লাল-সবুজের পতাকা
শহিদের আত্মত্যাগ
ডিজিটাল বাংলাদেশ,
বিশ্বে রোল মডেল
পৃথিবীর বুকে চির অম্লান
আমার সোনার বাংলাদেশ।

৮ম শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ

নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে বাংলাদেশের প্রথম জয়

আগুন ঝরা মার্চে নারী ওয়ানডে বিশ্বকাপে নিউজিল্যান্ডের হ্যামিল্টনে নিজেদের তৃতীয় ম্যাচে পাকিস্তানকে হারিয়ে নিজেদের প্রথম জয় তুলে নিয়েছে বাংলাদেশের বীর নারী ক্রিকেট দল। বিশ্বকাপের সূচি প্রকাশের পর তৈকেই বাংলাদেশের আসল সুযোগ হিসেবে ধরা হচ্ছিল ১৪ই মার্চে ম্যাচটিকে। যেখানে প্রতিপক্ষ ছিল পাকিস্তান নারী ক্রিকেট দল। সেই সুযোগটি কাজে লাগালো বাংলাদেশ। এর আগে বাংলাদেশ পুরুষ ক্রিকেট দল ১৯৯৯ সালে প্রথমবারের মতো ওয়ানডে বিশ্বকাপ খেলতে গিয়ে পাকিস্তানকে হারিয়েছিল।

বাংলাদেশ সময় ভোর চারটায় শুরু হয় খেলা। টসে জিতে বাংলাদেশকে ব্যাটিং-এ পাঠায় পাকিস্তান। উদবোধনী জুটিতে ৩৭ রান তোলেন শামিমা সুলতানা ও শারমিন আক্তার। ফারজানা হক, অধিনায়ক নিগার সুলতানা ও শারমিন আক্তারের ব্যাটিং নৈপুণ্যে নির্ধারিত ৫০ ওভারে ৭ উইকেটে ২৩৪ রান সংগ্রহ করে বাংলাদেশ। ফারজানা হক ১১৫ বলে ৭১ রানের ইনিংস খেলেন। এছাড়া নিগার সুলতানা ৬৪ বলে ৪৬ ও শারমিন আক্তার ৫৫ বলে ৪৪ রান করেন। বাংলাদেশের দেওয়া ২৩৫ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে ৫০ ওভারে ৯ উইকেটে ২২৫ রান করে পাকিস্তান। বাংলাদেশ জয় পায় ৯ রানে।

২৩৫ রানের লক্ষ্যে ব্যাট করতে নেমে পাকিস্তানের শুরুটা ছিল দুর্দান্ত। উদ্বোধনী জুটিতে সিদরা আমিন ও নাহিদা খান তুলে ফেলেন ৯১ রান। নাহিদা ৪৩ রানে ফিরে যান। শেষ পর্যন্ত ১৪০ বলে ১০৪ রানের ইনিংস খেলেছেন সিদরা আমিন, তবে বাংলাদেশের জয় আটকাতে পারেননি।

৮ ওভারে ৩৮ রানের বিনিময়ে তিন উইকেট নিয়ে ম্যাচসেরা হয়েছেন বাংলাদেশের ফাহিমা খাতুন। রুমানা আহমেদের শিকার দুটি উইকেট। এছাড়া জাহানারা আলম ও সালমা খাতুন একটি করে উইকেট নিয়েছেন।

প্রতিবেদন : মেজবাউল হক

বিশ্বসেরা বিদ্যাপীঠে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা

শিক্ষা, গবেষণা, সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে অবদানের জন্য যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বসেরা বিদ্যাপীঠ। যুক্তরাজ্যের সবচেয়ে পুরনো এই বিশ্ববিদ্যালয়টি চালু হয়েছিল ১০৯৬ সালে। শুধু যুক্তরাজ্যের নয়, বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীরাও এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পান। অত্যন্ত প্রতিযোগিতাপূর্ণ হলেও বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরা নিজেদের যোগ্যতাবলে অর্জন করে নিচ্ছে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার। অক্সর্ফোড জয়ী এমনই কয়েকজন শিক্ষার্থীর গল্প তোমাদের জানাব।

তাসনিম জারা: যুক্তরাজ্যের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসের (এনএইচএস) চিকিৎসক তাসনিম জারা বাংলাদেশে এমবিবিএস সম্পন্ন করে যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর করেছেন। করোনাকালে সম্মুখসারির যোদ্ধা তিনি। হাসপাতালে কাজের অভিজ্ঞতা আর স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা মেনে সহজ ও প্রাঞ্জল বাংলায় করোনা চিকিৎসা-বিষয়ক কন্টেন্ট নির্মাণ করেন তাসনিম। যা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে ইতোমধ্যেই তাকে এনে দিয়েছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লিনিক্যাল সুপারভাইজার (আন্ডারগ্রাজুয়েট) হিসেবে যোগ দিয়েছেন ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। তাসনিম জারাকে 'ভ্যাক্সিন লুমিনারি' হিসেবেও স্বীকৃতি দিয়েছে ব্রিটিশ সরকার।

মুনজেরিন শহীদ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ থেকে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শেষ করেন চট্টগ্রামের মেয়ে মুনজেরিন। এরপর ২০২০ সালের ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটিতে আবেদন করেন মুনজেরিন। পরে ডাকও পেয়ে যান। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ইংরেজিতে কথা বলার সহজ উপায় বলে দিয়ে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন মুনজেরিন। সম্প্রতি তিনি বিশ্বে ইংরেজি ভাষার সবচেয়ে পুরনো ও বিখ্যাত যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে অ্যাপ্লায়েড লিঙ্গুয়েস্টিক অ্যান্ড সেকেন্ড ল্যাঙ্গুয়েজ একুইজিশন নিয়ে স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন এবং পেয়েছেন সনদও।

মোহাম্মদ উজ্জ্বল হোসাইন : মাওলানা ভাসানী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (মাভাবিপ্রবি) প্রথম শিক্ষার্থী হিসেবে মোহাম্মদ উজ্জ্বলহোসাইন অধ্যয়নের সুযোগ পেয়েছে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। তবে এ যাত্রাটা তার বেশ প্রতিকূল ছিল। প্রথম দুবছর টানা অক্সফোর্ডে পড়ার সুযোগ পেলেও ফান্ডিংয়ের অভাবে তিনি সেখানে যেতে পারেননি।কিন্তু তাতে দমে যাননি উজ্জ্বল। তৃতীয় বছর আবার আবেদন করে সেবার ফুল ফান্ডিং এর সুযোগ পান।

আনিশা ফারুক: যেখানে অক্সফোর্ডে পড়ার সুযোগ পাওয়াটাই অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার, সেখানে বিশ্ববিদ্যালয়টির ছাত্র ইউনিয়নের (অক্সফোর্ড স্টুডেন্ট ইউনিয়ন) সভাপতি হিসেবে বাংলাদেশের আনিশা ফারুক নির্বাচিত হয়েছেন।

ইতিহাসে তিনিই প্রথম বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত; যিনি ১৫২৯ ভোট পেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই দায়িত্বে নির্বাচিত হন। ২০১৯ সালের ৫ই ফেব্রুয়ারি অক্সফোর্ডের ওয়েস্টন লাইব্রেরিতে আনিশা ফারুককে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি লেবার ক্লাব তাকে এই পদে ভূষিত করে। আনিশা এর আগে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের লেবার পার্টির কো চেয়ার হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন। অক্সফোর্ড ছাত্র সংসদ শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা নীতি নির্ধারণ ও দাবি-দাওয়া নিয়েই কাজ করে না। পাশাপাশি জাতীয় শিক্ষা কারিকুলামের উচ্চশিক্ষায় সরকারের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও কাজ করে থাকে। আনিশা ফারুক শুধু বাংলাদেশ নয়, এশিয়ান বংশোদ্ভূত দ্বিতীয় শিক্ষার্থী যিনি এই গৌরব অর্জন করলেন।

আহমেদ ইত্তিহাদ: ২০২০ সাল। এইচএসসি পরীক্ষায় বসা হয়নি তার। ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজের পাঠও চুকেনি। তার আগেই সুযোগ পেয়ে গেলেন অক্সফোর্ডে পড়ার। মোটেই সহজ ছিল না তার অক্সফোর্ড যাত্রা। অক্সফোর্ডের আগে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (এমআইটি) ও প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটিতে আবেদন করে ব্যর্থ হয়েছেন। তবে হতাশ হননি। বিশ্বের নানা দেশে অধ্যয়নরতদের কাছ থেকে পরামর্শ নিয়ে পরিশ্রম করে গেছেন।

অক্সফোর্ডের টিউশন ফি বেশি হওয়ায় রিচ অক্সফোর্ড স্কলারশিপের জন্য আবেদন করেন ইত্তিহাদ। বর্তমানে তিনি এই স্কলারশিপে সম্পূর্ণ বিনা খরচে অক্সফোর্ডের ম্যানসফিল্ড কলেজে গণিতে স্নাতক করছেন। হোস্টেলে থাকা ও খাওয়ার খরচ বিশ্ববিদ্যালয়ই বহন করছে।

জাহিদ আমিন (শাশ্বত): অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের জলবায়ু পরিবর্তন ও ব্যবস্থাপনা বিষয়ে স্নাতকোত্তরের সুযোগ পাওয়া বাংলাদেশের এই শিক্ষার্থী এর আগে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক করেছেন। অক্সফোর্ডে পড়ার জন্য 'অক্সফোর্ড ওয়েডেনফেল্ড অ্যান্ড হপম্যান' বৃত্তির জন্য মনোনীত হয়েছিলেন জাহিদ।

আফরিন সুলতানা চৌধুরী: অক্সফোর্ড জয়ী আরেক শিক্ষার্থী তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে স্যার উইলিয়ামডন স্কুল অব প্যাথলজিতে স্নাতকোত্তরের সুযোগ পেয়েছেন। সাথে পেয়েছেন ইউরোপীয় ইউনিয়নের ইরাসমাস মুন্ডাস স্কলারশিপ। তিনি এর আগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ও বায়োটেকনোলজি বিভাগে অধ্যয়ন করেছেন। এছাড়া তিনি সুইডেনের কারোলিন্সকা ইনস্টিটিউট থেকে ইন্টার্নশিপ করার সুযোগ লাভ করেছিলেন।

ডা. মো. সাজেদুর রহমান শাওন: ঢাকা মেডিকেল কলেজের এ শিক্ষার্থী অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পপুলেশন হেলথ এ পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। এছাড়া তিনি সুইডেনের কারোলিন্সকা ইনস্টিটিউট থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন।

বর্তমানে বাংলাদেশের অনেক শিক্ষার্থী অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার মাধ্যমে একদিকে যেমন তাদের নিজেদের স্বপ্নকে পূরণ করতে পেরেছেন, অন্যদিকে পরবর্তী প্রজন্মকে বিশ্বের সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পড়বার জন্য উদ্বুদ্ধ করছেন। তাদের অনুকরণে আগামীতে আরো অধিক সংখ্যক বাংলাদেশি শিক্ষার্থী পড়বে বিশ্বের সেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোয়, এ ব্যাপারে আশাবাদী হওয়াই যায়। ■

প্রতিবেদন : রফিকুল ইসলাম

এইচএসসি'র ফলে সবদিক দিয়ে এগিয়ে মেয়েরা

এইচএসসি পরীক্ষায় পাসের এবং জিপিএ-৫ প্রাপ্তির দিক থেকে ছেলেদের তুলনায় এবারও মেয়েরা এগিয়ে। ১৩ই ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত এইচএসসি ফলাফলে দেখা যায়, মেয়েদের পাসের হার ৯৬.৪৯ এবং ছেলেদের পাসের হার ৯৪.১৪ শতাংশ। আর জিপিএ ৫ প্রাপ্তিতে মেয়েদের হার ১৫.৬১, ছেলেদের হার ১৩.৭৯ শতাংশ।

এবার এ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন ছাত্র ৭ লাখ ১৫ হাজার ৫১৬ জন, এরমধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৬ লাখ ৭৩ হাজার ৫৮০ জন। পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী ছাত্রী ছিলেন ৬ লাখ ৫৬ হাজার ১৬৫ জন, এরমধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৬ লাখ ৩৩ হাজার ১৩৮ জন। অর্থাৎ পাশের হার ছাত্রী ৯৬.৪৯ শতাংশ এবং ছাত্র ৯৪.১৪ শতাংশ।

এবারের ফলাফলে জিপিএ ৫ প্রাপ্তির দিক থেকেও মেয়েরা এগিয়ে। জিপিএ ৫ পেয়েছেন মোট ১ লাখ ৮৯ হাজার ১৬৯ জন। এরমধ্যে ছাত্রী ১ লাখ ২ হাজার ৪০৬ জন আর ছাত্র ৮৬ হাজার ৭৬৩ জন। অর্থাৎ জিপিএ ৫ প্রাপ্তিতে মেয়েদের হার ১৫.৬১ শতাংশ ছেলেদের হার ১৩.৭৯ শতাংশ।

পা দিয়ে লিখে এইচএসসিতেও জিপিএ ৫ তামান্নার শুধু একটি পা (বাঁ পা)দিয়ে লিখে এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় জিপিএ ৫ পেয়েছেন তামান্না আক্তার নূরা। তিনি যশোরের ঝিকরগাছা উপজেলার বাঁকড়া ডিগ্রি কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে এবার উচ্চ মাধ্যমিক (এইচএসসি) পরীক্ষা দিয়েছিলেন। তামান্না এসএসসি, জিএসসি ও পিইসিতে জিপিএ-৫ পেয়েছিলেন।

অদম্য এ তামান্নার জন্ম থেকেই দুটি হাত নেই, নেই ডান পা। আছে শুধু বাম পা টি। তাই দিয়ে ছয় বছর বয়স থেকেই তার মা-বাবা চেষ্টা শুরু করেন লেখা চর্চা করানো। কিন্তু ঠিকমতো হচ্ছিল না; পা দিয়ে লেখা সে তো সহজ বিষয় নয়। হাল ছাড়েননি তারা। ভর্তি করে দেন বাঁকড়া আজমাইন এডাস স্কুলে। মাত্র দুই মাসের মাথায় পা দিয়ে সাবলীলভাবে লেখা শুরু করে তামান্না। সাথে ছবি আঁকাও। এরপর একের পর এক সাফল্য। ২০১৩ সালে পঞ্চম শ্রেণিতে জিপিএ ৫ পান, পান বৃত্তিও। এরই ধারাবাহিকতায় জেএসসি পরীক্ষাতেও পান জিপিএ ৫। এসএসসি, এইচএসসিতেও জিপিএ ৫। তামান্না শুধু লেখাপড়াও আঁকাআঁকিতে ভালো তা নয়, সে একজন ভালো তার্কিকও।

তামান্নার বাবা রওশন আলী ঝিকরগাছার ছোটো পৌদাউলিয়া মহিলা মাদ্রাসার শিক্ষক। মা খাদিজা পারভীন গৃহিনী। তিন ভাইবোনের মধ্যে সবার বড়ো তামান্না। নানা প্রতিকূলতা মোকাবিলা করে সামনে এগিয়ে চলা এই অসাধারণ মেধাবী কন্যাটি যেন সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহন করতে পারে নবারুণের বন্ধুরা এই কামনাই করছে। ■

প্রতিবেদন: জান্নাতে রোজী

বিশ্ব ডাউন সিনড্রোম দিবস

প্রতিবছর ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সারা বিশ্বে ২১শে মার্চ বিশ্ব ডাউন সিনড্রোম দিবসটি উদ্‌যাপিত হয়। জাতিসংঘ ২০১২ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ব ডাউন সিনড্রোম দিবসকে স্বীকৃতি দেয়। তখন থেকেই ডাউন সিনড্রোম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তিদের মানবাধিকার, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, কর্মসংস্থান ও অন্যান্য মৌলিক অধিকারগুলো নিশ্চিত করার প্রত্যয় নিয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দিবসটি উদ্‌যাপিত হয়ে আসছে।

বাংলাদেশে ২০১৪ সাল থেকে দিবসটি উদ্‌যাপিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কমিউনিকেশন ডিজঅর্ডারস বিভাগ শুরু থেকেই বাংলাদেশে ডাউন সিনড্রোম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু ও ব্যক্তিদের ভাষিক যোগাযোগের অধিকার নিশ্চিতকরণে সচেতনতা সৃষ্টিতে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে। কমিউনিকেশন ডিজঅর্ডারস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ডাউন সিনড্রোম সোসাইটি অব বাংলাদেশ যৌথভাবে এ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দিবসটি উদ্‌যাপন করে। এ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থবারের মতো বিশ্ব ডাউন সিনড্রোম দিবস উদ্‌যাপিত হয়।

'Inclusion Means-একীভূত সমাজ ব্যবস্থা, অংশগ্রহণে বাড়ায় আস্থা' এ স্লোগানকে প্রতিপাদ্য করে ২১শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে দিনব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে বিশ্ব ডাউন সিনড্রোম দিবস পালিত হয়। সকাল ১০টায় সব শ্রেণি পেশার মানুষ ও ডাউন সিনড্রোম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন শিশু, কিশোর ও ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি বর্ণাঢ্য র‍্যালি মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তন থেকে শুরু হয়। র‍্যালি শেষে আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক মো. আখতারুজ্জামান।

ডাউন সিনড্রোম সম্বন্ধে সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, ডাউন সিনড্রোমে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সামাজিক অধিকার আদায়, সামাজিক বিভিন্ন কর্মসূচিতে সাধারণ জনগণের ন্যায় ডাউন সিনড্রোমে আক্রান্ত ব্যক্তিদেরও অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, সর্বোপরি ডাউন সিন্ড্রোমে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য ভালোবাসাময় একটি পৃথিবী গড়ার লক্ষ্যেই দিবসটি উদ্‌যাপন করা হয়।

ডাউন সিনড্রোম কোনো রোগ নয়, এটি বিশেষ ধরনের জেনেটিক বা জিনগত অবস্থা। ডাউন সিনড্রোম নিয়ে জন্ম নেয়া মানুষের ক্রোমোজোমের গঠন সাধারণ মানুষের ক্রমোজমের চেয়ে কিছুটা ভিন্ন হয়ে থাকে। বাংলাদেশে ডাউন সিনড্রোম রোগের সঠিক পরিসংখ্যান না থাকলেও মাঝে মাঝে এ রোগে আক্রান্ত রোগী দেখা যায়। যেমন- এদের সাধারণত চাপামুখ, চিবুক, ঘাড় ও চেখ ছোটো হয় এই শিশুদের। এসব বাচ্চাদের হৃদযন্তের অসুখ, শ্রবণ ও শ্বাসের সমস্যা থাকতে পারে। মাংসপেশিও দূর্বল থাকে। এসব কারণে অন্যদের তুলনায় এরা দেরিতে বসে, হামাগুড়ি দেয় ও হাঁটে। কথা বলতেও এদের দেরি হয়। সব মিলিয়ে এদের স্বাভাবিক বিকাশে সমস্যা দেখা দেয়। ব্রিটিশ চিকিৎসক জন ল্যাংডন ডাউন সর্বপ্রথম ১৮৬৬ সালে এ সমস্যায় আক্রান্ত শিশুদেরকে চিহ্নিত করেন বলে তার নামানুসারে একে ডাউন সিনড্রোম নামকরণ করা হয়। জন ল্যাংডন ডাউন, ডাউনই সিনড্রোমের আবিষ্কারক।

২০০৫ সালে ফ্রেঞ্চ জীনতাত্ত্বিক গবেষণা সংস্থা AFRT (The French Association for Research on Trisomy 21) ২১শে মার্চকে ডাউন সিনড্রোমের জন্য প্রতীকী দিন হিসেবে ঘোষণা করে এবং সে বছর ২১শে মার্চ তারা ডাউন সিনড্রোম এর গবেষণা ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে 'From patient to research, better understand to better help শিরোনামে একটি বৈজ্ঞানিক সম্মেলন এর আয়োজন করে। পরবর্তীতে ডাউন সিনড্রোম নিয়ে কাজ করে যাওয়া আরো কিছু সংস্থা যেমন European Down Syndrome Association (EDSA), Down Syndrome International (DSI) ২১শে মার্চকে ডাউন সিনড্রোম এর জন্য প্রতীকী দিন হিসেবে পালন করতে AFRT এর সাথে একমত পোষণ করে।

এরপর ২০০৫ সাল থেকে প্রতিবছর ২১শে মার্চ AFRT ডাউন সিনড্রোম বিষয়ক কনফারেন্সের আয়োজন করে আসছে। অবশেষে ডাউন সিনড্রোম বিষয়ক সচেতনতার এই আন্দোলনের সাথে বিশ্বের সকল দেশকে যুক্ত করতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা WHO ২০০৭ সালের ২০শে ডিসেম্বর ২১শে মার্চকে World Down Syndrome Day হিসেবে ঘোষণা করে। এরই ধারাবাহিকতায় জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ২০১১ সালের ১৯শে ডিসেম্বর এক ঘোষণায় জাতিসংঘের অন্তর্ভুক্ত সকল সদস্য দেশ এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাকে প্রতি বছর ২১শে মার্চ যথাযোগ্য মর্যাদায় World Down Syndrome Day হিসেবে পালনের আমন্ত্রণ জানায়। ডাউন সিনড্রোম নিরাময় হয় না। তবে প্রাথমিক চিকিৎসা ও যত্নের মাধ্যমে শারীরিক সমস্যাগুলো নিয়ন্ত্রণে আনা যায়। পুষ্টিকর খাবার, স্পিচ ও ল্যাগুয়েজ থেরাপি এবং ফিজিক্যাল থেরাপি দিলে ভুক্তভোগী শিশুরা বড়ো হয়ে অনেকটা স্বাভাবিক জীবন কাটাতে পারে। ■

প্রতিবেদন: সানজানা তালুকদার

১৪ বছরের নিচে শিশুকে কাজে নেওয়া যাবে না

আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। কিন্তু শিশুরা অনেকসময় নানা ধরনের নিপীড়নের শিকার হয়। শিশুশ্রম একটি ভয়ংকর সামাজিক ব্যাধি। একটি দেশের আগামী প্রজন্মকে ধ্বংস করে দেয় এই শিশুশ্রম। শিশুদের ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্যেই 'আইএলও কনভেনশন-১৩৮' অনুসমর্থনের প্রস্তাব অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। এর ফলে সাধারণভাবে ১৫ বছরের কম বয়সি কোনো শিশুকে শ্রমে নিয়োজিত করা যাবে না। তবে দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা বিবেচনা করে যদি বয়স কমাতে হয়, তাহলেও তা ১৪ বছরের কম করা যাবে না। মন্ত্রিসভা মনে করে, বাংলাদেশের জন্য ১৪ বছরই মানানসই। ২৭শে ফেব্রুয়ারি মন্ত্রিসভার নিয়মিত বৈঠকে এই প্রস্তাব অনুমোদন দেওয়া হয়। প্রধানমন্ত্রী তার সরকারি বাসভবন গণভবন থেকে এ বৈঠকে ভার্চুয়ালি যুক্ত হয়ে সভাপতিত্ব করেন। আর মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা সচিবালয়ে সভায় অংশ নেন।

আমাদের মৌলিক শিক্ষা (বেসিক এডুকেশন) শেষ করতে প্রায় ১৫ বছর লাগে, সুতরাং ১৫ বছরের কম বয়সি কোনো শিশুকে কাজে লাগানো যাবে না। তবে কোনো দেশ যদি আর্থসামাজিক অবস্থা বিশেষভাবে বিবেচনা করে এই বয়স কমাতে চায়, তাহলে তা ১৪ বছর পর্যন্ত করতে পারবে। এর কম বয়সি কাউকে কাজে লাগানো যাবে না।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব আরো বলেন, ১৪ হোক বা ১৫ বছর, এসব শিশুকে কোনো অবস্থাতেই কোনো ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত করা যাবে না। যেসব কাজে দুর্ঘটনা বা জীবননাশের আশঙ্কা আছে, সেসব কাজে শিশুদের নিয়োজিত করা যাবে না। আর এই বয়সি শিশুদের কাজে লাগানো হলেও এই উদাহরণ সাবালক বলে ব্যবহার করা যাবে না। বিয়ে বা বিভিন্ন মামলা-মোকদ্দমায় সাবালক হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। এই বয়সে কেউ অপরাধ করলে 'শিশু অপরাধী' হিসেবেই গণ্য করা হবে। ১৪ বা ১৫ বছরের কম বয়সি কোনো শিশুকে কেউ যদি কাজে নিয়োজিত করে, তাহলে শ্রম আইন অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হবে বলেও মন্ত্রিপরিষদ সচিব উল্লেখ করেন।■

প্রতিবেদন : তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

ঐতিহাসিক সিরিজ জয় বাংলাদেশের

দক্ষিণ আফ্রিকার সেঞ্চুরিয়নে প্রথম ম্যাচ জিতে ইতিহাস রচনা করেছে বাংলাদেশ। অপেক্ষা ছিল প্রথমবার সিরিজ জয়ের। দক্ষিণ আফ্রিকার বেলোর কাগিসো রাবাদার শর্ট অব আ লেংথ বলে কাট করে পয়েন্ট দিয়ে চার মারেন সাকিব আল হাসান। ইতিহাস গড়া হয়ে গেল তাতেই। স্বাগতিকদের বিপক্ষে এবার সিরিজ জয়ের মহাকাব্য লিখলেন টাইগারেরা। শেষ ওয়ানডে ম্যাচে ৯ উইকেটের জয়ে তিন ম্যাচের সিরিজ ২-১ ব্যবধানে জিতে নিলেন তামিম-সাকিবরা। এর মাধ্যমে ১২০ পয়েন্ট নিয়ে আইসিসি বিশ্বকাপ সুপার লিগের পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে থাকল বাংলাদেশ। দেশের ক্রিকেট ইতিহাসে এটি বড়ো অর্জন। অনন্য এ অর্জনে বাংলাদেশ দলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মো. আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। শুধু তাই নয়, সিরিজ জয়ের পুরস্কার হিসেবে দলের জন্য তিন কোটি টাকা বোনাস ঘোষণা করেছে বিসিবি। শেষ ম্যাচে ৫/৩৫ ও সিরিজ সেরা (৮ উইকেট) হয়েছেন তাসকিন আহমেদ।

সফরের প্রথম ম্যাচ জিতলেও দ্বিতীয় ম্যাচে হেরে ১-১ সমতায় থাকা সিরিজের শেষ ম্যাচটি অলিখিত ফাইনালে রূপ নেয়। ম্যাচে তাসকিনের অসাধারণ বোলিংয়ে ৩৭ ওভারে ১৫৪ রানে অলআউট হন প্রোটিয়ারা। বাংলাদেশের বিপক্ষে এটি তাদের সর্বনিম্ন দলীয় সংগ্রহ। জবাবে তামিমের ফিফটিতে ১৪১ বল বাকি থাকতেই ১ উইকেট হারিয়ে জয় তুলে নেয় বাংলাদেশ। দেশের বাইরে ওয়েস্ট ইন্ডিজ, জিম্বাবুয়ে, কেনিয়া ও আয়ারল্যান্ডের পর এবার দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে সিরিজ জিতে গেল বাংলাদেশ। যে মাটিতে কখনো জিততে পারেনি শ্রীলঙ্কা। সেই মাটিতেই লাল-সবুজের বিজয় নিশান উড়ালেন টাইগাররা। এ নিয়ে চতুর্থবার ৯ উইকেটে জয় পেল বাংলাদেশ।

দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ছয়বার সিরিজ খেলে দুবার জয়ের স্বাদ পেল বাংলাদেশ। ২০১৫ সালে দেশের মাটিতে প্রোটিয়াদের তিন ম্যাচের সিরিজে ২-১ ব্যবধানে হারিয়েছিল টাইগাররা। এবার দক্ষিণ আফ্রিকার মাটিতে তিন ম্যাচের সিরিজে তাদের ২-১ ব্যবধানে হারালো। ■

প্রতিবেদন : মো. আবু নাসের

শিশু যখন খেতে চায় না

শিশুর আসোলে কোনো রোগ নেই, সমস্যাটা তার মনে। বয়স অনুযায়ী মানসিক ও শারীরিক বিকাশ অন্য বাচ্চাদের মতো হলে শিশুর খাওয়া নিয়ে মা-বাবার দুশ্চিন্তা করার কিছু নেই।

তবে কিছু বাচ্চা আছে যারা, সত্যি সত্যি খায় না। তাদের বৃদ্ধিটাও ঠিকমতো হয় না। তাহলে দেখতে হবে যে বাচ্চাটি অপুষ্টির শিকার হচ্ছে কিনা বা তার রক্তশূন্যতা হয়েছে কি না? না কি বাচ্চার ঘন ঘন কোনো সংক্রমণ হচ্ছে, যার জন্য খাওয়ায় রুচি কমে যাচ্ছে। যদি শিশুটির রক্তশূন্যতা থাকে, অপুষ্টি থাকে–বাচ্চাটি বসে থাকবে, খুব বেশি সচল থাকবে না। তাহলে এগুলো দেখতে হবে। যেমন- পরিপূর্ণভাবে খিদে না লাগলে শিশুরা খেতে চায় না। এছাড়া জোর করে খাওয়ানো, ভালোভাবে খিদে লাগেনি বলে প্লেটের খাবার সে শেষ করতে পারবে না।

যখন-তখন খাবার দেওয়ার কারণেও যথাসময়ে তার খিদে লাগবে না। আর সে খেতেও পারবে না। অনেক শিশু স্কুল থেকে ফিরেই বিস্কুট, ফল বা ফলের রস ইত্যাদি খায়। তার এক ঘণ্টা পর হয়ত দুপুরের খাবারের সময়। তখন সে ঠিকমতো খেতে চাইবে না, কারণ ইতোমধ্যেই তার খিদে নষ্ট হয়ে গেছে। মূল খাবারের সময় তেমন কিছুই খায় না।

শিশুর পছন্দসই খাবার রান্না করা উচিত। শিশু খাবারের যথাযথ স্বাদ অনুভব করতে না পারলে ওই খাবারের প্রতি তার এক ধরনের বিরক্তি তৈরি হবে।

বয়সভেদে শিশুর ক্ষুধা লাগার সময়ে কিছুটা পার্থক্য আছে। শিশুকে সব সময় নিয়ম বা সময়সূচি অনুযায়ী খেতে অভ্যস্ত করতে হবে। শিশু খেতে চাইছে না বা খাচ্ছে না – এ অজুহাতে তাকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাবার দেওয়া ঠিক না। শিশু একেবারেই খেতে না চাইলে প্রয়োজনে চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলতে হবে। যখন-তখন খাবার দিয়ে তার খিদে নষ্ট করা যাবে না।

সাধারণত দুই থেকে তিন বছর বয়সি বাচ্চাদের প্রতিবেলা খাবারের মাঝে দুই থেতে তিন ঘণ্টা বিরতি থাকা উচিত। বিরতির এই সময়ে যদি অন্য কোনো খাবার সে না খায়, তবে যথাসময়ে তার ক্ষুধা লাগার কথা।

তিন থেকে চার বছর বয়সিদের জন্য তিন থেকে চার ঘণ্টা বিরতিতে খাবার দেওয়া উচিত। এভাবে বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কিশোর বয়স পর্যন্ত প্রতি বেলা খাবারের মাঝের বিরতি একটু একটু করে বাড়বে। এরপর বড়োদের সঙ্গে তিন বেলা খাবারের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

শিশুকে কখনো জোর করে খাওয়ানো যাবে না। তাকে একবার জোর করে খাওয়ালে পরে সে খাবার দেখলে ভয় পাবে। খাবারের প্রতি তার আগ্রহ কমে যাবে। এক সময় খাবারের প্রতি তার বিতৃষ্ণা জন্মাতে পারে।

শিশুদের টিভি বা কার্টুন দেখিয়ে খাবার খাওয়ালে এগুলোতে সে অভ্যস্ত হয়ে যাবে। এমনিতেই বেশি সময় টিভি দেখা শিশুর জন্য স্বাস্থ্যকর নয়। টিভি দেখার সময় খাওয়ালে শিশুর বদহজম হওয়ার ঝুঁকি বাড়ে। কারণ এ সময় টিভিতে মনোযোগ থাকার কারণে পাকস্থলী থেকে প্রয়োজনীয় পাচক রস নিঃসৃত হয় না।

প্রতিদিন এক ধরনের খাবার না দিয়ে নতুন নতুন খাবার দিলে বাচ্চার খাবারের প্রতি আকর্ষণ বাড়বে।■

প্রতিবেদন : মো. জামাল উদ্দিন

দশদিগন্ত

শাকসবজি দিয়ে বাংলাদেশের পতাকা

শস্যক্ষেত্রের শাকসবজি দিয়ে এক লাখ এক বর্গফুটের বিশাল বাংলাদেশের পতাকা তৈরি করেছেন জামালপুরের কৃষক আব্দুর রাজ্জাক রাঙা। এই অভূতপূর্ব সৃষ্টি করে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন তিনি। বাংলাদেশের এই পতাকা নির্মাণের মাধ্যমে তিনি নিজের দেশপ্রেম জাগ্রত করার পাশাপাশি নিজের শিল্পীসত্তারও প্রকাশ করেছেন। জামালপুরের কৃষক রাঙা সাভারে এসে দীর্ঘ চার বছরের প্রচেষ্টায় এ জাতীয় পতাকা নির্মাণে সফল হয়েছেন। সবুজ-লাল শস্যের সমন্বয়ে সৃষ্ট বিশাল এই পতাকা দেখতে ভিড় জমিয়েছিলেন অসংখ্য দর্শনার্থীসহ সরকারের প্রতিনিধিগণও। রাঙা সবুজ আয়তক্ষেত্রটি পূর্ণ করেছেন সারি সারি লাউ গাছ দিয়ে। আর মাঝের বৃত্তটি লালশাকের আবরণে ঢাকা হয়েছে। রাঙা তার এই সৃষ্টি দিয়ে বাংলাদেশকে নতুনরূপে তুলে ধরতে চান বিশ্বের মানুষের কাছে। তাই এখন তার লক্ষ্য গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম লেখানো।

বিড়ালের স্কুলে স্নাতক ডিগ্রি

বন্ধুরা, বলছি ব্যতিক্রমধর্মী একটি স্কুলের কথা। তবে এই স্কুলটি পোষা প্রাণীর জন্য। হ্যাঁ বন্ধুরা, বিশ্বে প্রথমবারের মতো পোষা প্রাণী বিড়ালের জন্য খোলা হয়েছে একটি স্কুল। ল্যাটিন আমেরিকার দেশ ইকুয়েডরে খোলা হয়েছে বিড়ালছানা কিন্ডারগার্টেন স্কুলটি। স্কুলটিতে বিড়ালদের ভালো আচরণ শেখানোর পাশাপাশি দেওয়া হয় স্নাতক ডিগ্রিও। এমন ডিগ্রি অর্জনের জন্য প্রতি বিড়ালের পিছনে খরচ হয় ২৫ ডলার। এই ব্যতিক্রম স্কুলের মালিক ক্যাথরিন লুগো। মূলত অভিভাবক ও বিড়ালছানাদের মধ্যে ভালোবাসার বন্ধন দৃঢ় করতে স্কুলটি শুরু করেন তিনি। এছাড়া তিনি স্কুলটিতে বিড়ালদের বিনোদন ও ভালো আচরণের জন্য গেমসের ব্যবস্থাও রেখেছেন। স্কুলটির তথ্যমতে, বিড়ালদের দুই থেকে চার মাস বয়সের মধ্যে ভালো ব্যবহার ও খারাপ উদ্দীপক শেখার ক্ষমতা তৈরি হয়। এই স্কুলটিতে ইতোমধ্যে অনেক আক্রমণাত্মক বিড়াল খুব সহজেই ভালো আচরণ শিখেছে। তার মধ্যে একটি বিড়াল 'হ্যারি' অন্যতম। তাই এই স্কুলে ভর্তি করিয়ে খুশি বিড়ালের অভিভাবকগণও।

ঘুম ভাঙাচ্ছেন শিক্ষক

শিক্ষকগণ আমাদের শিক্ষা দেন, তাই না বন্ধুরা। আজ এমন একজন শিক্ষকের কথা বলব যিনি শিক্ষা দেওয়ার পাশাপাশি প্রতিদিন ভোরে ছাত্রছাত্রীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে নাম ধরে ডেকে ঘুম থেকে তোলেন। তার হাঁকডাকে তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে পড়তে বসে যায় শিক্ষার্থীরা। বলছি ভারতের পশ্চিমবঙ্গের জোড়পাটকি হাই স্কুলের শিক্ষক জীবন বসাক-এর কথা। তিনি নিজে রোজ কাকডাকা ভোরে ঘুম থেকে উঠে তৈরি হয়ে বাইক দিয়ে বেরিয়ে পড়েন। এলাকার প্রতিটি গলি ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ঘুম থেকে জাগান তিনি। শিক্ষার্থীদের মাধ্যমিক ও

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার সিলেবাস শেষ করানোকে প্রাধান্য দিয়ে এমন উদ্যোগ নিয়েছেন তিনি। আর মাস্টারমশাইয়ের ডাকে ঘুম থেকে উঠে খাতা-বই নিয়ে পড়তে বসে যায় ছাত্রছাত্রীরা। রাতে কে কতক্ষণ পড়েছে, কতক্ষণ ঘুমিয়েছে, সকালে পড়তে বসেছে কিনা সমস্ত খবরাখবর নেন জীবন বসাক। ছোটোবেলায় মাধ্যমিক দেওয়ার সময় তার এক শিক্ষক এমনভাবে পড়াশোনার অভ্যাস করানোর জন্য ভোরে ঘুম থেকে জাগিয়ে দিতেন তাকে। সেই সময় বিষয়টি তার বিরক্তিকর মনে হলেও পরে তিনি অনুভব করেন এমন উদ্যোগ-এর জন্যই সে আজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে। জীবন বসাকের এমন অভিনব উদ্যোগে খুশি স্কুলপড়ুয়াদের বাবা-মায়েরাও। লকডাউনের সময় স্কুল বন্ধ থাকা অবস্থায় পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে তিনি ছাত্রদের ক্লাস নিয়ে সবার নজর কেড়েছিলেন। এবার মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের ঘুম ভাঙিয়ে দিয়ে প্রশংসা কুড়িয়েছেন তিনি।

প্রতিবেদন: সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

লন্ডনে বাংলায় রেলস্টেশনের নাম

লন্ডনের ব্যস্ততম হোয়াইটচ্যাপেল স্টেশনটির নাম ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা অক্ষরে শোভা পাচ্ছে। পূর্ব লন্ডনের বাংলাদেশি অধ্যুসিত টাওয়ার হ্যামলেটস এলাকার একটি পাতাল রেলস্টেশনের নাম লেখা হয়েছে বাংলায়। ১০ই মার্চ সকাল থেকে ব্যস্ততম হোয়াইটচ্যাপেল স্টেশনটির নাম ইংরেজির পাশাপাশি বাংলা অক্ষরে শোভা পাচ্ছে। এটি যুক্তরাজ্যে বাংলায় রেলস্টেশনের নাম লেখার প্রথম ঘটনা।

বিভিন্ন তরফ থেকে দাবির পরিপ্রেক্ষিতে হোয়াইটচ্যাপেল স্টেশনের নামটি বাংলায় লেখার সিদ্ধান্ত নেয় ট্রান্সফোর্ড ফর লন্ডন অথরিটি (টিএফএল)। লন্ডনের ব্যস্ততম এই এলাকার স্টেশনটির নাম বাংলায় লেখার বিষয়টিকে অত্যন্ত গৌরবের ও ইতিহাস সৃষ্টিকারী অর্জন বলে মনে করছেন প্রবাসীরা। তাঁরা বলছেন, বহু ভাষাভাষীর এই লন্ডনে স্টেশনে লাগানো বর্ণগুলো যুগ যুগ ধরে বাংলা ও বাঙালির শক্তি ও সামর্থ্যের জানান দেবে।

স্টেশনের একাধিক প্রবেশদ্বারে বাংলায় 'হোয়াইটচ্যাপেল স্টেশন' লেখার পাশাপাশি স্টেশনের প্রবেশপথে 'হোয়াইটচ্যাপেল স্টেশনে আপনাকে স্বাগত' কথামালাও শোভা পাচ্ছে। প্রায় এক বছরের বেশি সময় ধরে হোয়াইটচ্যাপেল স্টেশনের সংস্কার কাজ চলছে। হিথ্রো বিমানবন্দরের সঙ্গে দ্রুত যোগাযোগ স্থাপনে চালু হতে যাওয়া কুইন এলিজাবেথ লাইনের সংযোগ থাকছে এই স্টেশনে।

শাহদাত হোসেন

বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

শব্দধাঁধা

পাশাপাশি: ৪.বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বেসামরিক সম্মাননা পদক, ৬. নির্মাণ, ৭.মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বদাকারী প্রথম অস্থায়ী সরকার যেখানে গঠিত হয়েছিল, ৮. বন

উপর-নিচ: ১. এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র, ২. ঘুঙুর, ৩. চলচ্চিত্র ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার জন্য প্রদান করা আন্তর্জাতিক পুরস্কার, ৫. বাগান, ৬.প্রয়োজন, ৭.বাচাল

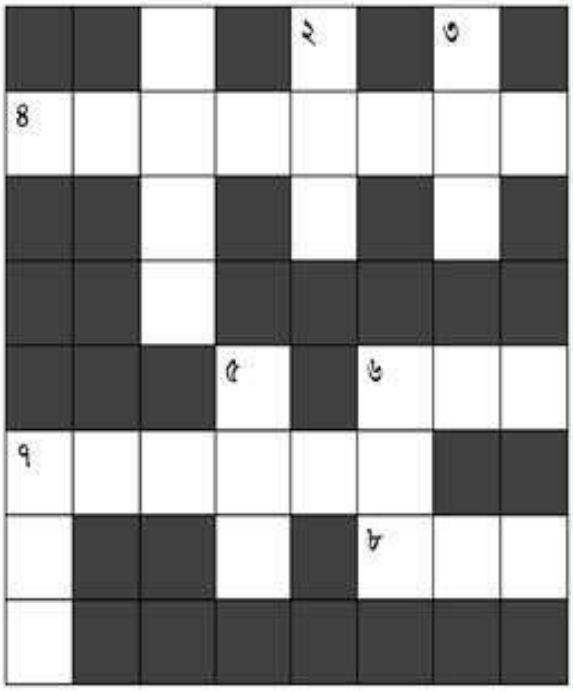

ছক মিলাও

শব্দ ধাঁধার মতই এক ধরনের ধাঁধা ছক মিলাও। ছকে যেসব শব্দ বসিয়ে মেলাতে হবে, তা নিচে সংকেতের পাশে দেওয়া হলো। বোঝার সুবিধার্থে একটি ঘর পূরণ করে দেওয়া হলো।

সংকেত: মুজিবনগর, সহনশীল, ধার, সজীবতা, লক্ষ, নখর ক্ষত, তখন, খনা, গগনচুম্বী, ধান, কচু

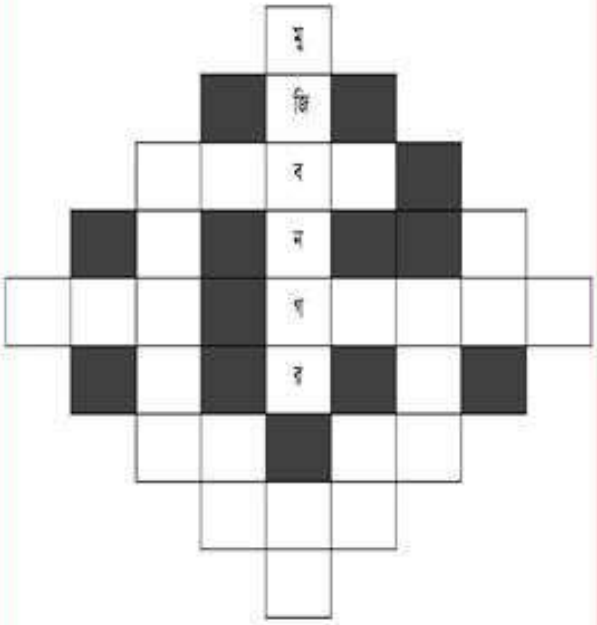

নাম্ব্রিক্স

নিচের ছকটির নাম নাম্বিক্স। ১-৮১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো থেকে ছকটিতে প্রতিটি সংখ্যা একবার করেও বসাতে হবে। সংখ্যাগুলোকে ক্রমিকভাবে বসাতে হবে। বসানোর সময় পরের সংখ্যা পাশাপাশি বা উপরে-নিচে আকারে বসবে, কোনাকুনি বসানো যাবে না।

৬৯				৭৩	৩৪	৩৩	২৪	২৩
	৭৯		৮১					
		৭৭		৭৫				
৬৬	৬৩			৬০				
	৬৪		৫৮			২৯	২৮	
৫৪		৫৬	৪১		৩৯			১৮
	৫২			১৩		১৫		৭
		৫০		১২			৯	
৪৭			৪৪	১				৫

ব্রেইন ইকুয়েশন

ব্রেইন ইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

৬	*		-	৪	=	
/		+		+		*
	*	১	-		=	১
+		*		-		+
২	*		-	৫	=	
=		=		=		=
	+	৬	+		=	১১

ফেব্রুয়ারি মাসের সমান

শব্দধাঁধা

বা	ং	লা	এ	কা	ডে	মি	■
হা	■	■	কা	■	■	ন	ব
ন্ন	■	স	ন্ত	র্প	ণ	■	র
■	■	হ	■	■	■	■	ক
■	■	স্র	■	ধা	রা	পা	ত
ব	■	■	আ	■	জ	■	■
স	মা	ধা	ন	■	শা	বা	ন
ন	■	■	ন	■	হী	■	■

ছক মিলাও

				ভা				
			পা	ষা	ণ			
		য	■	আ	■	ম		
	■	ন্ত্র	■	ন্দো	■	হা	ট	
টা	ল	মা	টা	ল	■	রা	■	■
	ব	ন	■	ন	ত	জা	নু	
		ব	ট	■	র	■		
			ক	ম	ল			
				ন				

ফেব্রুয়ারি মাসের সমান

নাম্ব্রিক্স

৭৭	৭৮	৮১	৭০	৬৯	৮	৭	৬	১
৭৬	৭৯	৮০	৭১	৬৮	৯	১০	৫	২
৭৫	৭৪	৭৩	৭২	৬৭	১২	১১	৪	৩
৬০	৬১	৬২	৬৩	৬৬	১৩	১৬	১৭	১৮
৫৯	৫৮	৫৭	৬৪	৬৫	১৪	১৫	২০	১৯
৫৪	৫৫	৫৬	৪৩	৪২	৩১	৩০	২১	২২
৫৩	৫২	৪৫	৪৪	৪১	৩২	২৯	২৮	২৩
৫০	৫১	৪৬	৩৯	৪০	৩৩	৩৪	২৭	২৪
৪৯	৪৮	৪৭	৩৮	৩৭	৩৬	৩৫	২৬	২৫

ব্রেইনইকুয়েশন

৫	*	৩	-	৮	=	৭
*		*		/		-
২	-	১	+	৪	=	৫
-		-		+		+
৪	+	২	+	৩	=	৯
=		=		=		=
৬	*	১	+	৫	=	১১

খাদিজাতুল কোবরা, পঞ্চম শ্রেণি, খিলগাঁও গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজ

সানজিনা সিদ্দীকি ওকি, দশম শ্রেণি, পাইকপাড়া স্টাফ কোয়ার্টার স্কুল, মিরপুর

মৌমিতা আক্তার বন্যা, পঞ্চম শ্রেণি, নতুন কুঁড়ি কিন্ডার গার্টেন, শেরপুর

আফরা তাহমিদ জারা, তৃতীয় শ্রেণি, হারম্যান মেইনার স্কুল

করোনা সংক্রমণ প্রতিরোধে নির্দেশনা

- শপিং মল ও বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতা এবং হোটেল-রেস্তোরাঁসহ জনসমাগমস্থলে বাধ্যতামূলক মাস্ক পরতে হবে।
- অফিস-আদালতসহ ঘরের বাইরে অবশ্যই মাস্ক ব্যবহার করতে হবে। স্বাস্থ্যবিধি বাস্তবায়নে সারা দেশে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হবে।
- রেস্তোরাঁয় বসে খেতে ও আবাসিক হোটেলে থাকতে অবশ্যই করোনার টিকা সনদ প্রদর্শন করতে হবে।
- ১২ বছরের বেশি বয়সি সব শিক্ষার্থীকে শিক্ষা মন্ত্রণালয় নির্ধারিত তারিখের পর টিকার সনদ ছাড়া শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে না।
- স্থলবন্দর, সমুদ্রবন্দর ও বিমানবন্দরে স্ক্রিনিংয়ের সংখ্যা বাড়াতে হবে। পোর্টগুলোতে ক্রুদের জাহাজের বাইরে আসার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা দিতে হবে। স্থলবন্দরগুলোতেও দেশের বাইরে থেকে আগত ট্রাকের সঙ্গে শুধু চালক থাকতে পারবেন। বিদেশগামীদের সঙ্গে আসা দর্শনার্থীদের বিমানবন্দরে প্রবেশ বন্ধ করতে হবে।
- বিদেশ থেকে আসা যাত্রীসহ সবাইকে বাধ্যতামূলক কোভিড-১৯ টিকার সনদ প্রদর্শন করতে হবে।
- সর্বসাধারণের করোনার টিকা ও বুস্টার ডোজ গ্রহণ ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় প্রয়োজনীয় প্রচার ও উদ্যোগ নেবে।
- পরবর্তী নির্দেশনা না দেওয়া পর্যন্ত উন্মুক্ত স্থানে সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও সমাবেশ বন্ধ রাখতে হবে।
- স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালন ও মাস্ক পরার বিষয়ে সব মসজিদে জুম্মার নামাজের খুতবায় ইমামরা সচেতন করবেন।
- কোনো এলাকার ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে সে ক্ষেত্রে স্থানীয় প্রশাসন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করে ব্যবস্থা নিতে পারবে।

Regd. Dha, 143-Monthly Nobarun, Vol-46, No-09, March 2022, Tk-20.00

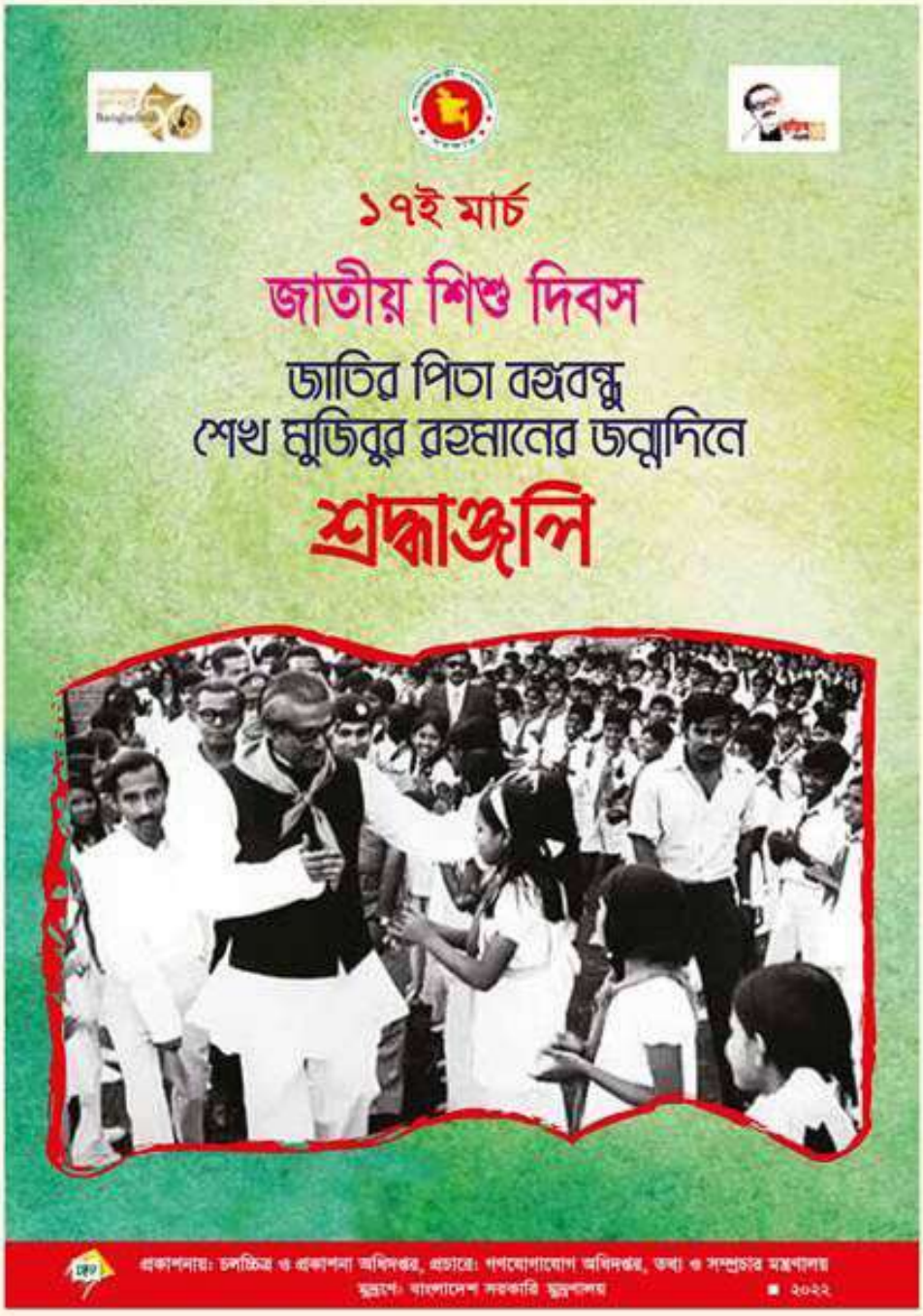

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়
তথ্য ভবন
১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা